সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
তত্ত্বীয়		১-৭৪
প্রথম অধ্যায়	সংগীতের নীতি	১-১২
প্রথম পরিচ্ছেদ	পরিভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	তাল ও ছন্দ প্রকরণ	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইতিহাস	১৩-৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংগীতগুণীদের জীবনী	২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	৬৭

ব্যাবহারিক		৭৫-১৯২
তৃতীয় অধ্যায়	শাস্ত্রীয়সংগীত	৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাগান	১১৪

প্রথম অধ্যায়

সংগীতের নীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিভাষা

রাগ

হিন্দুস্তানি সংগীতে রাগের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা শুনলে শ্রোতার মনোরঞ্জন হয় তাকে রাগ বলে। অবশ্য এ থেকে সংগীতে রাগের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ হয় না। রাগ বলতে স্বর সমষ্টি দ্বারা গঠিত মনোরঞ্জনকারী এবং আরোহী ও অবরোহীর একটি বিশিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি রক্ষাকারী রচনাকে বোঝায়। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রে স্বর ও বর্ণ দ্বারা বিভূষিত জনচিত্তের রঞ্জক ধ্বনি বিশেষকে রাগ বলা হয়েছে।

স্বর এবং বর্ণের পারিভাষিক ব্যাখ্যায় বর্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে গাওয়ার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকেই বর্ণ বলে। বর্ণ চার প্রকার যথা: স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ এবং সঞ্চারী বর্ণ।

স্থায়ী বর্ণ

একই স্বরকে বার বার উচ্চারণ করাকে স্থায়ী বর্ণ বলে।

আরোহী বর্ণ

ষড়জ থেকে নিষাদ পর্যন্ত পর পর স্বরগুলো গাওয়া হলে তাকে আরোহী বর্ণ বলে।

অবরোহী বর্ণ

নিষাদ থেকে ষড়জে ফিরে আসাকে অবরোহী বর্ণ বলে।

সঞ্চারী বর্ণ

যে বর্ণে আরোহ ও অবরোহের মিশ্রণ ঘটে অর্থাৎ একত্রে মিলিত হয় তাকে সঞ্চারী বর্ণ বলে।

যেকোনো গায়কের গায়কীর মধ্যে এই চারটি বর্ণ উপস্থিত থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ রাগের মধ্যে নিশ্চিতরূপে আরোহ ও অবরোহ থাকা আবশ্যক।

রাগ লক্ষণ

সংগীতশাস্ত্রে রাগের দশটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়বত্ব ও ঔড়বত্ব।

বর্তমানকালে রাগের গড়নে যেসব লক্ষণ মেনে চলা হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১। রাগ রচনার জন্য কোনো ঠাট থেকে স্বর নিতে হবে।

২। কোনো রাগেই 'সা' স্বরটি বর্জিত হবে না।

৩। কোনো রাগেই মধ্যম (ম) ও পঞ্চম (প) স্বর এক সঙ্গে বর্জিত হবে না। অর্থাৎ ম ও প এর অন্তত একটি থাকতে হবে।

৪। রাগে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর থাকতে হবে। তবে পাঁচটি স্বর সপ্তকের একই অঙ্গে থাকলে চলবে না। পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গে কমপক্ষে দুইটি করে স্বর থাকতে হবে।

৫। রাগের রঞ্জকতা গুণ থাকতে হবে।

৬। রাগে কোনো বিশেষ রসের অভিব্যক্তি থাকবে।

৭। রাগে আরোহী এবং অবরোহী দুটোই থাকতে হবে এবং তা বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলবে।

৮। রাগে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী (রাগ বিশেষে), বর্জিত (রাগের নিয়মমাফিক) স্বর থাকবে এবং জাতি, পকড়, সময়, অঙ্গ, আলাপ বা বিস্তার, তান, বোলতান, বাঁট, সরগম, প্রভৃতি প্রদর্শিত হবে।

৯। রাগের জাতি, বিভাগ, আরোহ ও অবরোহ স্বর ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। যেমন: সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব এরূপ ৯টি জাতিভেদ আছে।

১০। কোনো রাগের আরোহ বা অবরোহে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পাশাপাশি অর্থাৎ পর পর লাগবে না। যেমন রে রে অথবা গ গ স্বর। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন: রাগ ললিত।

ঠাট ও রাগের তুলনা

ঠাট	রাগ
১। সপ্তকের স্বর থেকে ঠাট উৎপন্ন হয়।	১। আশ্রয় রাগ বা জনক রাগ (ঠাটবাচক) থেকে রাগের সৃষ্টি হয়।
২। ঠাটের সাত স্বর ক্রমানুসারে হতে হবে।	২। রাগে স্বরের ব্যবহার জাতি অনুসারে হয়ে থাকে।
৩। ঠাট গাওয়া বা বাজানো যায় না।	৩। রাগ গাওয়া বা বাজানো যায়।
৪। ঠাটে রঞ্জকতা দরকার নেই।	৪। রাগে রঞ্জকতা আবশ্যক।
৫। ঠাটে সাত স্বরের কম বা বেশি হবে না।	৫। রাগের জাতি অনুসারে স্বর ব্যবহার হয়। পাঁচটির কম স্বরে রাগ হয় না।
৬। ঠাটে আরোহী ও অবরোহীর প্রয়োজন হয় না।	৬। রাগে আরোহী ও অবরোহী দুইটিরই প্রয়োজন।
৭। ঠাটে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, (রাগ বিশেষে) ও বর্জিত স্বর এবং অঙ্গ, জাতি, পকড়, সময়, বিস্তার, তান , বোলতান, বাঁট, সরগম ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই।	৭। রাগে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী (রাগ বিশেষে) ও বর্জিত স্বর নির্দিষ্ট থাকে এবং অঙ্গ, জাতি, পকড়, সময়, বিস্তার, তান, বোলতান, বাঁট, সরগম ইত্যাদি আবশ্যক।
৮। ঠাটে (স্বর কাঠামোতে) প্রদর্শিত স্বর অনুযায়ী রাগের নাম অনুসারে ঠাটের নামকরণ করা হয়।	৮। রাগের নামকরণ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়।

সপ্তক

সাধারণভাবে সপ্তক বলতে সাতটি স্বরের সমষ্টিকে বোঝায়। সপ্তক তিন প্রকার– মন্দ্র সপ্তক, মধ্য সপ্তক ও তার সপ্তক । মন্দ্র, মধ্য, তার সপ্তককে যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা সপ্তকও বলা হয়।

মন্দ্র সপ্তকের যেকোনো একটি স্বর মধ্য সপ্তকে দ্বিগুণ উঁচুতে অবস্থান করে। আবার, মধ্য সপ্তকের যেকোনো একটি স্বর তার সপ্তকে দ্বিগুণ উঁচুতে অবস্থান করে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের কণ্ঠস্বর তিন সপ্তক অবধি ব্যবহার হয়। তবে সমবেত যন্ত্রসংগীতে, কর্ড ব্যবহারে ও রাগ আলাপে অতিরিক্ত আরও দুইটি সপ্তকের ব্যবহার হতে পারে যা অতি মন্দ্র ও অতি তার নামে চিহ্নিত।

আলাপ

রাগের চলন অনুযায়ী স্বর বিন্যাসই হচ্ছে আলাপ যা গীত আরম্ভের পূর্বে রাগের আবহ সৃষ্টি করার জন্য পরিবেশন করা হয়। আলাপ অর্থ কথোপকথন। আর কথোপকথনের মাধ্যমেই হয় পরিচয়। তাই রাগের সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচয়ের প্রক্রিয়াকেই আলাপ বলা যায়। আলাপের মাধ্যমেই রাগের রূপ প্রকাশ পায় এবং এতে শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। রাগের বাদী-সমবাদী স্বরকে ঘিরে অনুবাদী স্বরসমূহের

সহযোগিতায় আলাপ আবর্তিত হতে থাকে। বাদী-সমবাদীকে ঘিরে আলাপ অংশ রাগের পরিচয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাদী স্বর রাগ বিশেষে আলাপের সাথে সংযুক্ত হয়ে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে। আলাপ প্রক্রিয়া স্বরের (সরগম) মাধ্যমে, বাণী বা পদ সহযোগে নোম্-তোম্ (ধ্রুপদ অঙ্গের পরিবেশনায়) অথবা আ-কার ইত্যাদিভাবে করা যায়। আলাপ দুই প্রকার। যথা– নিবদ্ধ আলাপ বা নোম্‌তোম আলাপ ও অনিবদ্ধ আলাপ বা আকার আলাপ।

নিবদ্ধ বা নোম্-তোম্ আলাপ

নোম্-তোম্ আলাপ রাগের ধ্রুপদ শৈলী পরিবেশনে করা হয়। ধ্রুপদ গানের শুরুতে বেশি দীর্ঘ সময় ধরে এই নোম্-তোম্ আলাপ করা হয়ে থাকে। বাণী বা পদের পরিবর্তে নে, তে, তেরি, চারু, নোম্, তোম্, তানা, দৃম, দেরে না, ইত্যাদি বর্ণ, অলংকার, মীড়, কণ্, গমক প্রভৃতিতে ভূষিত করে রাগের রূপ প্রকাশ করা হয়। ধ্রুপদে বাণী ও তাল সহযোগেও বিভিন্ন লয়ে আলাপ করা যায়।

অনিবদ্ধ বা আ-কার আলাপ

রাগ পরিবেশনের শুরুতে কণ্ঠসংগীতে পদ বা বাণী উচ্চারণ না করে রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোকে আ-কার দ্বারা সংক্ষেপে রাগের রূপ প্রকাশ করা হয়। আবার তাল সহযোগে বাণী বা পদের এক ঘেয়েমী কাটাতে অথবা সরগম প্রক্রিয়ার মাঝে মাঝে আ-কার আলাপ করা হয়।

বোলবিস্তার

বোল অর্থ কথা বা বাণী। বোলবিস্তার অর্থ কথার আলাপ। রাগ শুরু হওয়ার পরে তালের ঠেকার সঙ্গে বিভিন্ন লয়ে বাণীর সাহায্য বা বাণীর অনুভূতিগুলো রাগের সুরের সাথে মিশিয়ে প্রকাশ করা যায় তাকে বোলবিস্তার বলা হয়। বোলবিস্তারে বন্দিশের মধ্যে যে সব শব্দ থাকে তা ব্যবহার করতে হবে। বন্দিশের বাইরের শব্দ নয়।

স্বরবিস্তার

তাল সহযোগে রাগের পরিবেশন করার সময় বাণী বা আ-কারের পরিবর্তে কখনও কখনও সরগম সহযোগে রাগের ভাব প্রকাশ করা হয়, যাকে স্বরবিস্তার বলে। স্বরবিস্তার বা সরগম করার সময় রাগের আবহ বা ঢংটি সরগম উচ্চারণের সাথে সাথে প্রযুক্ত হয়।

বাদ্যযন্ত্র, যেমন– সরোদ, সেতার, বেহালা, বাঁশি, সানাই ইত্যাদিতে রাগ পরিবেশনার সময় তাল ছাড়া এবং তাল সহযোগে বিস্তার করা হয়। তাল ছাড়া বিস্তারের সময় অনিবদ্ধভাবে লয় বা ছন্দ ব্যবহার করা হয়।

তান

বিস্তারের গতি দ্রুত ও অবিচ্ছিন্নভাবে সমাবিষ্ট হলে এরকম অলংকারিক ক্রিয়াকে তান বলে। বিস্তার এবং তানের মধ্যে তুলনাগত গতির সাথে স্বর প্রয়োগের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। বিস্তারের সময় স্বরগুলোকে ধীর গতিতে ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিটি স্বর স্পষ্ট ও স্থিরভাবে গেয়ে বা বাজিয়ে রাগ-রূপের বিন্যাস করা হয়। কিন্তু তানের সময় স্বরগুলোকে তালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দ্রুততর ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়। তানের প্রধান উদ্দেশ্য গানের বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং কণ্ঠস্বরকে মার্জিত করা। যন্ত্রসংগীতে তানের প্রক্রিয়াকে 'তোড়া' বলা হয়। আধুনিককালে তান ক্রিয়া সরগম ও আ-কার উভয়ভাবেই করা হয়। তানের অনেক প্রকার আছে যাকে তানের জাতি বলা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– ১। শুদ্ধতান বা সপাটতান ২। কূটতান ৩। মিশ্রতান ৪। বোলতান ৫। অলংকারিকতান ৬। গমকতান ৭। ছুটতান ইত্যাদি।

শুদ্ধতান বা সপাটতান

তান পরিবেশন করার সময় স্বরগুলোকে সরল গতিতে প্রকাশ করাকে শুদ্ধতান বলা হয়। শুদ্ধতানকে সপাট তানও বলা হয়। যেমন– রাগ ইমন এ সপাটতান: নি়রে গম̍ ধনিসা̍।

কূটতান

তান পরিবেশনের সময় স্বরগুলোকে বক্র গতিতে প্রকাশ করাকে কূটতান বলা হয়। কূট অর্থ জটিল। কূটতান অসংখ্য প্রকার হতে পারে। যেমন– সারে সাগ গ গরে গগ সারে সারে সাগ রেগ সারে রেসা। এখানে সা রে ও গ তিনটি স্বরের মধ্যে তানের জটিল ক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

মিশ্রতান

শুদ্ধ ও কূটতানের মিশ্রণে মিশ্রতান উৎপন্ন হয়। যেমন– রাগ ইমন-এ মিশ্র তান: নি়রে গম̍ পধ পম̍ গম̍ গপ রেপ ম̍গ ধপ নিনি ধপ ম̍গ রেসা।

বোলতান

বোল শব্দের অর্থ হচ্ছে কথা বা গানের ভাষা। ভাষাকে অর্থাৎ গানের বাণীকে তানের মতো করে পরিবেশন করলে তাকে বোলতান বলা হয়। যেমন– রাগ ভূপালীতে বোলতান: সা̍রে গপ ধসা̍ ধপ সা̍সা̍ ধপ গরে সাসা

অলংকারিকতান

বর্ণ বা অলংকারযুক্ত তানকে অলংকারিকতান বলা হয়। যেমন–রাগ ভূপালীতে অলংকারিক তান: সারে গরে গপ গপ ধপ ধসা̍।

উপরিউক্ত তানের লেখা দেখে জটিল মনে হলেও তা আসলে অলংকারিক। এখানে সারেগ রেগপ গপধ পধসা̍ অলংকারটির ঢং বা ছন্দ অবিচ্ছিন্নভাবে করা হয়েছে।

গমকতান

তান পরিবেশনের সময় স্বরগুলোকে গমকযুক্ত করা হলে তাকে গমকতান বলা হয়।

ছুটতান

উচ্চ স্বর থেকে দ্রুত নিম্ন স্বরের দিকে বা নিম্ন স্বর থেকে দ্রুত উচ্চ স্বরের দিকে উল্লম্ফন বা ছুটে আসাকে ছুটতান বলা হয়।

সংগীতের উপাদান

আধুনিককালের সংগীতে পূর্ণতা সাধনে প্রধানত ছয়টি উপাদান ব্যবহৃত হয়। তা হলো সুর ও ধ্বনি (tune), ছন্দ (rhythm), শব্দতরঙ্গের তারতম্য (timbre), নিনাদের উচ্চতা ও নিম্নতা (dynamic), ধ্বনির বুনন বা নকশা (texture), এবং সুরের কাঠামো (form)। বর্তমানকালের সংগীত কর্ডনির্ভর ও ঐকতান (harmony)-ধর্মী। এই উপাদানগুলোর সাথে প্রযুক্তি ও ডিজিটাল যন্ত্রাংশের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সংগীত নির্মাণ এবং সুরের সামঞ্জস্য রাখার জন্যও এর অপরিহার্যতা রয়েছে। সংগীত নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনটি দিক সর্বদা উপস্থিত থাকে তা হলো: ধারণা, আচরণ এবং শব্দ প্রয়োগ। এর মাধ্যমে তাল, সুর এবং ছন্দ, কাউন্টারপয়েন্ট এবং অর্কেস্ট্রা তৈরি হয়। বিশ শতকের শেষের দিকে সংগীত সামাজিক সংযুক্তি এবং শারীরিক সম্পৃক্ততার দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করে। এতে অভিনয়, নাট্য, নৃত্য, চলচ্চিত্র, আবহসংগীত, প্রতিবেশ, মাল্টিমিডিয়া প্রভৃতির সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সংগীতের উপাদান সম্পর্কে ধারণা ও তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাল ও ছন্দ প্রকরণ

বাজানোর সময় 'ডাইনা এবং বাঁয়া দ্বারা পৃথক কিংবা যৌথভাবে কতিপয় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই ধ্বনি সংখ্যা ১০টি এবং ধ্বনিগুলোকে বর্ণ বলা হয়। এই ১০টি বর্ণের মধ্যে ৬টি 'ডাইনার সাহায্যে ২টি 'বাঁয়া'র সাহায্যে এবং ২টি উভয় যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

ক. 'ডাইনা'র বর্ণ:	১। তানা ২। তিন/তি, ৩। তুন/তু
	৪। দিন/থুন ৫। তে/তি ৬। রে/টে
খ. 'বায়া'র বর্ণ:	১। ক/কে/কা/কু। কৎ
	২। গে/ঘে।

গ. যৌথভাবে 'ডাইনা' ও 'বাঁয়া'র সাহায্যে উৎপন্ন: ১। ধা ২। ধিন।

হিন্দুস্তানি সংগীতে তালের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত পরিবেশনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে একটি গতিময় আবহ সৃষ্টি হয়। এই গতি বা লয়ের স্থিতি নিরূপণের জন্য তবলার পরিভাষা জানা একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া তবলায় স্বতন্ত্র [লহড়া] বাদনও হতে পারে।

সংগীতে কালের পরিমাপকে তাল বোঝায়। তাল সম্পর্কে তবলার পরিভাষায় একটু পরিষ্কার ধারণা দিতে গেলে বলা যায়- "একাধিক মাত্রা দ্বারা ছন্দোবদ্ধভাবে গঠিত কয়েকটি পদের সমষ্টিকে তাল বলে।" মাত্রা হচ্ছে তালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা লয়কে পরিমাপ করে। ১/২/৩/৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা মাত্রাকে নির্দিষ্ট করা হয়। আর কোনো তালে একাধিক মাত্রা ছন্দোবদ্ধভাবে দুই বা ততোধিক পদ বা বিভাগ গঠন করে। প্রতিটি তালের জন্য নির্দিষ্ট ঠেকা বা বোল থাকে। বোল রচিত হয় তবলার বর্ণ সহযোগে। উল্লেখ্য যে, তবলায় আরও অনেক যুক্ত বর্ণ আছে।

তাল দুই প্রকার। যথা: ক. সমপদী তাল ও খ. বিসমপদী তাল।

ক. সমপদী তাল: যে সকল তালের পদ বিভাগগুলো সমান সংখ্যক মাত্রার দ্বারা গঠিত সেই সকল তালকে সমপদী তাল বলে। যথা: দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি।

খ. বিসমপদী তাল: যে সকল তালের পদ বিভাগগুলো অসমান সেই সব তালকে বিসমপদী তাল বলে। যথা: তেওড়া, ঝাঁপতাল, ধামার তাল ইত্যাদি।

লয়

সংগীতে আরোপিত সময়ের অবিচ্ছেদ্য গতিকে লয় বলে। লয় প্রধানত তিন প্রকার, যথা: ১। বিলম্বিত লয় ২। মধ্যলয় ও ৩। দ্রুতলয়। এ ছাড়া মাত্রার ভগ্নাংশ দ্বারা বহু প্রকার লয় হতে পারে। যেমন—আড়, কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি। লয় থেকেই লয়কারীর সৃষ্টি।

আবর্তন

যেকোনো তালের 'সম' থেকে 'সম' পর্যন্ত একবার ঘুরে আসাকে এক আবর্তন বলে। এইরূপ যতবার ঘুরবে তত আবর্তন হবে।

সম

যেকোনো তালের প্রথম মাত্রাকে সম বলা হয়। 'সম' তালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কারণ, 'সম' থেকেই তালের শুরু এবং 'সম'–এ এসেই তালের শেষ। স্বরলিপিতে '+' যোগ চিহ্ন বা '×' চিহ্ন দিয়ে 'সম' বোঝানো হয়।

খালি বা ফাঁক (অনাঘাত)

তালের অন্তর্গত যে বিভাগকে হাতের সাহায্যে অনাঘাত দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে খালি বা ফাঁক বলা হয়। '০' [শূন্য] চিহ্ন দ্বারা ফাঁক চিহ্নিত করা হয়।

তালি (আঘাত)

তালের অন্তর্গত বিভাগের প্রারম্ভিক মাত্রাতে তালি বা শব্দের দ্বারা আঘাত করে প্রকাশ করাকে তালি বলে। তালিকে স্বরলিপিতে ২য়, ৩য় ইত্যাদি অবস্থানবাচক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

বোল বা ঠেকা

'ডাইনা' এবং 'বাঁয়া'র ন্যূনতম কতকগুলো বর্ণকে প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট মাত্রা, বিভাগ, তালি, খালি ঠিক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ লয়ে বাজানোকে তালের বোল বা ঠেকা বলে।

আবর্তন

আবর্ত বা আবর্তন শব্দের অর্থ হলো চক্রাকারে ঘোরা। কোনো তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত বাজাবার পর আবার প্রথম মাত্রায় ফিরে এসে নতুন করে পুরো তালটি বাজাতে হয়। এইভাবে প্রতিবারই একই নিয়মে চক্রাকারে ঘুরতে হয়। একেই বলা হয় আবর্ত বা আর্বতন।

দাদরা তালের কথাই ধরা যাক। এটি ৬ মাত্রার তাল। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ মাত্রার পর আবার ঘুরে আসতে হয় প্রথম মাত্রায় এবং সম্পূর্ণ তালটিকে এই ৬ষ্ঠ মাত্রার মধ্যেই ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হয়। এইরকম যতবার ঘোরা হবে, তাকে তত আবর্তন বলা হবে। প্রতিবার ঘোরার শেষে ১ম মাত্রায় এসে পড়লেই কিন্তু আবর্তন সম্পূর্ণ হয়।

কায়দা

কোনো তালের চেহারা এবং বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে এবং তার মাত্রা ও বিভাগের কোনো পরিবর্তন না করে, এক বা একাধিক আবর্তনে কিছু বাছাই করা বর্ণসমষ্টি নিয়ে রচিত এক বিশেষ ধরনের বোলকে কায়দা বলে। এই ধরনের বোলগুলির একটি খুব বড়ো রকমের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই নির্দিষ্ট বর্ণসমষ্টিকে উল্টে-পাল্টে নানারকমভাবে বাজানো যায়। এই সময় নতুন কোনো বাণী কিন্তু এই সমষ্টির মধ্যে যুক্ত করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে ত্রিতালের একটি কায়দা দেওয়া হলো–

ধা	ধা	তে	টে	।	ধা	ধা	তু	না	।	তা	তা	তে	টে	।	ধা	ধা	তু	না	।
+					২					০					৩				

পাল্টা

কায়দার নির্দিষ্ট বর্ণ সমষ্টিকে এইভাবে উল্টে-পাল্টে এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যে নতুন বোল রচিত হয়, তাকেই বলা হয় পাল্টা। কায়দা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে যে এর বৈশিষ্ট্য হলো একে নানারকমভাবে উল্টে-পাল্টে বাজানো যায়। উল্টে-পাল্টে বাজানোর সময়েও কিন্তু তালের রূপ ঠিকমতো রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কায়দার মূল রচনায় ব্যবহৃত বর্ণের বাইরের কোনো বর্ণ বাজানো হবে না। যেমন– কায়দার উদাহরণে

দেওয়া বোলটিকে এইভাবে বাজানো যেতে পারে পাল্টা হিসেবে–

ধা ধা তে টে । তে টে ধা ধা । ধা ধা তে টে । ধা ধা তু না

+ ২ ০ ৩

তা তা তে টে । তে টে তা তা । ধা ধা তে টে । ধা ধা তু না

+ ২ ০ ৩

রেলা

সংশ্লিষ্ট তালের তালি, খালি, বিভাগ ও তালরূপকে পুরোপুরি বজায় রেখে ধিরধির, ধিরধির, কিটতক-জাতীয় বর্ণসমষ্টির প্রাধান্যে রচিত এক বিশেষ ধরনের বোলের নাম রেলা। আকৃতির দিক থেকে এই বোল অনেকটা কায়দার মতো। তবে কায়দার সঙ্গে রেলার প্রধান পার্থক্য এই যে, কায়দা সাধারণত বাজানো হয় আটগুণ লয়ে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ত্রিতালের একটি রেলার মূল রচনা দেওয়া হলো–

ধাSতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক । ধাSতেরে কেটেতাক তুSনাS কেটেতাক।

+ ২

তাSতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক । ধাSতেরে কেটেতাক তুSনাS কেটেতাক।

০ ৩

টুকড়া

কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ বর্ণসমষ্টি নিয়ে হয় টুকড়া। কণ্ঠসংগীতের তান এবং ততবাদ্যের জোড়ার মতোই তবলার হলো টুকড়া। এই টুকড়া এক থেকে তিন আবর্তন পর্যন্ত হতে পারে। টুকড়ার মধ্যে বর্ণ, লয় বা অন্যকিছুর বিধিনিষেধ বড়ো একটা থাকে না। যেকোনো বর্ণসমষ্টি, যেকোনো লয়কারীতে বাজানো যেতে পারে। এগুলি তিহাইযুক্তও হতে পারে অথবা তিহাই ছাড়াও হতে পারে। টুকড়ার কিন্তু কোনো বিস্তার হয় না। যেমন–

ধা ধা তেরে কেটে | ধা তেরে কেটে ধা | তী ধা ক্রা Sন |

+ ২ ০

ধা কৎ তা S | ধা তেরে কেটে ধা | তু না কৎ তা |

৩ + ২

ধা Sক Sৎ তা | ধা Sক Sৎ তা | ধা

০ ৩ +

গৎ

সাধারণভাবে তিহাইহীন এক বা দুই আবৃত্তির একটি বিশেষ ধরনের বোলকে গৎ বলা হয়। এর বিস্তার হয় না, কিন্তু ঠায় বা বরাবর লয়ে বাজাবার পর একই সঙ্গে পরপর দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে বাজানো হয়।

যে সমস্ত গৎ এ আগাগোড়া একটি লয়-ই থাকে, তাকে শুদ্ধ লয়কারীর গৎ এবং একাধিক লয়বিশিষ্ট গৎকে মিশ্র বা মিশ্রিত লয়কারীর গৎ বলা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ত্রিতালের একটি গৎ এর নমুনা নিচে দেয়া হলো :

ধেৎ	তাগে	তিন	নাগে	।	তেরেকেটে	তুনা	কেড়ে	নগ।
+					২			
তেটে	কতা	কতা	ধাগে	।	তেটে	ঘেড়ে	Sন	ধিন।
০					৩			
ধাগে	Sতা	কেটে	ধাগে	।	ধিনা	ঘেড়ে	নগ	ধিন।
+					২			
তাকে	তেকা	তেরেকেটে	ধাধা	।	ধেরেধেরে	কেটেতাক	তাকতেরে	কেটেতাক।
০					৩			

মুখড়া ও মোহড়া

উপর্যুক্ত শব্দ দু'টি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, জোরালো ছোটো বোলকে মুখড়া এবং মোলায়েম ছোটো বোলকে মোহড়া বলা হয়। আর একদল বলেন, সমে এসে মিলবার জন্য যে বোল বাজানো হয়, তাকেই বলা হয় মুখড়া বা মোহড়া। এদের মতে মুখড়া এবং মোহড়া একই জিনিস, কারণ 'মুখ' শব্দ থেকে এসেছে মুখড়া এবং 'মুহ' শব্দ থেকে এসেছে মুহড়া বা মোহড়া।

ভিন্নমতে, গান বা বাজনা আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গে সমে এসে মিলবার জন্য যে ছোটো ধরনের বোল বাজানো হয়, তাই হলো মুখড়া আর গান-বাজনার মাঝখানে যে বোল বাজানো হয়, তাকে বলে মোহড়া। এদের মতে মুখড়াকে ছোটো উঠান বলা যেতে পারে। কেউ-কেউ আবার মুখড়া কথাটিকে প্রধানত গানের এবং মোহড়া কথাটিকে তবলার বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের বক্তব্য, গায়কেরাই বেশির ভাগ মুখড়া কথাটি ব্যবহার করেন এবং তবলিয়ারা ব্যবহার করেন মোহড়া শব্দটি।

উপরিউক্ত মতগুলি পর্যালোচনা করলে কিন্তু মনে হয় যে, এই শব্দ দু'টির মধ্যে খুববেশি পার্থক্য না থাকলেও, এদের পুরোপুরি এক বলা যায় না। বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে আমরা তাই প্রচলিত বোল অনুসারে এদের দু'টি ভাগেই আলাদা করে দেখাবো। এখানে একটি চার মাত্রার মুখড়া দেওয়া হলো :

ক্রানতেরে	কেটেতাক্	তাSতেরে	কেটেতাক্	।	ধা
৩					+

সাধারণত এইরকম চার মাত্রা, ছয় মাত্রার ছোটো বোলকেই মুখড়া বলা যেতে পারে, যা বাজিয়ে মুখে বা সম্-এ আসা হয়। মুখড়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বড়ো এই জাতীয় বোলকে আমরা মোহড়া বলতে পারি। যেমন–

তাক	তুনা	কেটেতাক	তুনা	।	কেটেতাক	তেরেকেটে	তাকতাS	তেরেকেটে	।	
+					২					
ধা	তেরেকেটে	তাকতাS	তেরেকেটে	।	ধা	তেরেকেটে	তাকতাS	তেরেকেটে	।	ধা
০					৩					+

চক্রদার

কোনো একটি তিহাইযুক্ত টুকড়াকে একই সঙ্গে পরপর তিনবার বাজিয়ে যদি সম্‌-এ এসে মিলে, তাহলে তাকে বলা হয় চক্রদার টুকড়া। চক্রাকারে ঘোরা হয় বলেই এর এইরকম নাম; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে টুকড়া এবং তিহাই– এই দু'টির মিশ্রণে তৈরি হয় একটি চক্রদার, কারণ চক্রদারে সম্পূর্ণ টুকড়াটিকেই তিহাই-এর মতো তিনবার বাজাতে হয়। যেমনঃ

ধাSন	ধিকিট	ধাতিরকিট	ধিকিট	।	কৎতি	টতিট	কতাগ	দিঘিন	।
+					২				
তাগিন	তাSন	তাSS	Sক্রি	।	ধাSন	ধাSন	ধাSক্রি	ধাSন	।
০					৩				
ধাSন	ধাSক্রি	ধাSন	ধাSন	।	ধা	SSS	ধাSন	ধিকিট	।
+					২				
ধাতিরকিট	ধিকিট	কৎতি	টতিট	।	কতাগ	দিঘিন	তাগিন	তান	।
০					৩				
তাSS	SSক্রি	ধাSন	ধাSন	।	ধাSক্রি	ধাSন	ধাSন	ধাSক্রি	।
+					২				
ধাSন	ধাSন	ধাS	SSS	।	ধাSন	ধিকিট	ধাতিরকিট	ধিকিট	।
০					৩				
কৎতি	টতিট	কতাগ	দিঘিন	।	তাগিন	তাSন	তাSS	SSক্রি	।
+					২				
ধাSন	ধাSন	ধাSক্রি	ধাSন	।	ধাSন	ধাSক্রি	ধাSন	ধাSন	ধা
০					৩				+

পেশকার

আদালতে যে কর্মচারি মামলার কাগজপত্র পেশ করেন, তাকে বলা হয় পেশকার এবং তাঁর পেশ করা কাগজপত্র থেকে যেমন কোনো মামলার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানা যায়, সেইরকম তবলায় যে বোল বাজানোর সঙ্গে-সঙ্গেই তবলিয়া কী তাল বাজাবেন, লয় ও লয়কারীতে তাঁর দক্ষতা কতখানি, হাত কী রকম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় পেশকার। পার্থক্য এই যে, আদালতে পেশকার একজন ব্যক্তি, আর সংগীতে একটি বিশেষ ধরনের বোল। অন্যভাবেও বলা যায়, যেকোনো রাগ গাইবার আগে গায়ক যেমন আলাপের সাহায্যে সেই রাগের গতি-প্রকৃতি এবং বৈশিষ্টগুলোর একটা মোটামুটি আভাস দেন, পেশকারও সেইরকম।

স্বভাবতই পেশকার বাজানো হয় লহরা শুরু করার সময়ে। কোনো ঘরানার বাদক শুরুতে উঠান বাজান, কোনো ঘরানার বাদক বাজান পেশকার। পরিবেশনের নিয়ম কিছুটা শিথিল হওয়ায় আজকাল অবশ্য উঠান বাজিয়ে ঠেকা ধরার পরে একই শিল্পী পেশকারও বাজান। পেশকার বাজানো হয় সাধারণত ঠায় বা বরাবর লয়কে ভিত্তি করে। তবে মূল বোলটি প্রথমে বাজিয়ে তারপর তার বিস্তার যখন করা হয়, তখন কিন্তু বিভিন্ন লয়কারীর পরিচয়ই পাওয়া যায়। একটু দোলানো ছন্দের এই বিশেষ ধরনের বোলে'ধীক্ ধিন্‌তা বা ধীক্র ধিন্‌তা'জাতীয় বোল খুববেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন–

ধীSSক্র	ধিন্Sধাs	SSধাS	ধিন্Sধাs ।	ধাSতিS	ধাSতিS	ধাSধাS	ধিন্Sধাs
+				২			
তীSSক্র	তিন্Sতাs	SSতাS	তিন্Sতাs ।	ধাSতিS	ধাSতিS	ধাSধাS	ধিন্Sধাs
০				৩			

ইত্যাদি।

এটি ত্রিতালের একটি পেশকারের প্রারম্ভিক বোল। এই ভিত্–এর ওপরেই গড়ে তোলা হয় বিস্তারের ইমারত এবং এই বোলের আসল কারিগরি সেখানেই।

তাললিপি পরিচিতি

তাল: চৌতাল

মাত্রা	১২
বিভাগ	৬
ছন্দ	২/২/২/২/২/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম, নবম এবং একাদশ মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	তালি তৃতীয় এবং সপ্তম মাত্রায় খালি
পদ	সমপদী
বাদন	পাখওয়াজ

চৌতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
বোল	ধা	ধা ।	দেন	তা।	কৎ	তাগে।	দেন	তা ।	তেটে	কতা ।	গদি	ঘেনে ।	ধা
চিহ্ন	×		২			০			৩				×

তাল: সুরফাক্তা বা সুরফাঁক তাল

মাত্রা	১০
বিভাগ	৫
ছন্দ	২/২/২/২/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম মাত্রা এবং সপ্তম মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	তৃতীয় এবং নবম মাত্রায়
পদ	সমপদী
বাদন	পাখওয়াজ

সুরফাক্তা বা সুরফাঁক তালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১
বোল	ধা	ঘেড়ে ।	নগ	দি ।	ঘেড়ে	নাগ ।	গদ	দি ।	ঘেড়ে	নাগ ।	ধা
চিহ্ন	×		০		২		৩		০		×

তাল: ঝম্পক (রাবীন্দ্রিক তাল)

মাত্রা:	৫
বিভাগ:	২
ছন্দ:	৩/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি :	প্রথম মাত্রা
খালি বা ফাঁক :	নাই
পদ:	বিসমপদী

ঝম্পক তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫
বোল	ধিন	ধিন	না	।	ধিন	না
চিহ্ন	×				১	

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। লয় কাকে বলে?
২। আবর্তন কী?
৩। সম কী?
৪। তালি ও খালি বা ফাঁক কাকে বলে?
৫। পাল্টা কী?
৬। ঝম্পক তালের পরিচিতি ও তাললিপি লেখ।
৭। চৌতালের পরিচিতি লেখ।
৮। সমপদী ও বিসমপদী তাল কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাগ কাকে বলে? রাগের লক্ষণগুলি লেখ।
২। বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কী কী?
৩। রাগ ও ঠাটের তুলনামূলক আলোচনা কর।
৪। আলাপ কী? আলাপ কত প্রকার? আলোচনা কর।
৫। তান কাকে বলে? তানের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
৬। তাল কাকে বলে? তাল কত প্রকার ও কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শাস্ত্রীয়সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সংগীত শুধু শিল্পকলাই নয়, বিজ্ঞানও বটে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে বহুযুগ অতিবাহিত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, মানুষের কণ্ঠে সর্বপ্রথম নির্গত হয়েছিল ধ্বনি এবং সুর, তারপর এসেছে কথা বলার ভাষা। আদিকাল থেকে মানুষের কণ্ঠে স্বরের সৃষ্টি থেকে সংগীতের যাত্রা। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ সংগীতের জন্ম। কারণ মানুষ ভাষা সৃষ্টির হবার আগেই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য স্বর ব্যবহার করত। উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতা যেমন বিভিন্ন ধারায় উৎকর্ষ লাভ করেছে, শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্রমবিকাশ ঠিক তেমনিভাবে হয়েছে। শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে মোটামুটিভাবে পাঁচ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট সংগীত গবেষক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মত অনুযায়ীঃ

১। আদিম ও প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০– খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০)।
২। বৈদিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০–খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০),
৩। বৈদিকোত্তর বা পৌরাণিক যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০–১২০৬ খ্রিষ্টপূর্ব),
৪। মধ্যযুগ (১২০৭ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং
৫। বর্তমান বা আধুনিক যুগ (১৭৫৮ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে চলমান)

প্রথম তিন পর্যায়কে 'প্রাচীন যুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করে সংগীতের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নিম্নে প্রাচীন যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন যুগ

(ক) প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগঃ আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ পর্যন্ত প্রাক-বৈদিক বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ বলা হয়। এই প্রাক-বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তুপ থেকে যে সব সংগীতের উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে চারুকলা ও সংগীত অনুশীলনের চেতনা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। তৎকালীন সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের চর্চা পরিশীলিত ও উন্নত মানের ছিল এবং অনুমান করা যায় যে, তখন একাধিক স্বর বিশিষ্ট সংগীতের প্রচলন ছিল। কয়েকটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশি এই সভ্যতার স্মৃতি-চিহ্নই প্রমাণ করে যে তখন সংগীতের স্বরের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাপ্ত নিদর্শনের দু-তিন বা তিন-চারটি তারযুক্ত কয়েকটি বীণা, মৃদঙ্গাদি, চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারী ও নৃত্যরত নর্তকের ভগ্নমূর্তি উল্লেখযোগ্য।

(খ) **বৈদিক যুগ**: আর্যদের আগমনের ফলে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তুপের ওপর গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতা। বেদের স্তোত্রগুলো গানের মতো সুর করে যজ্ঞানুষ্ঠানে গাওয়া হতো। খ্রি. পূ ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যে উৎপত্তি হয়েছিল গান্ধর্বসংগীত। ইতিহাসবিদদের মতে, এদেশের ললিতকলার উৎকর্ষতা মৌর্যযুগ থেকে (খ্রি. পূর্ব. ৩২৪) শুরু করে গুপ্ত রাজত্বকালের (৪র্থ শতক) শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বৈদিক যুগের গান বলতে আমরা বুঝি সামগান। প্রধানত যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগান গাওয়া হতো। বৈদিক প্রাতিশাখ্য তথা নারদীয় শিক্ষা, পাণিনি, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষাগুলো থেকেই সে সময়ের সংগীত সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যা লিখে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এই যুগে মাত্র তিনটি স্বর দিয়ে সামগান গাওয়া হতো।

সামিক যুগে ব্যবহৃত তিনটি স্বরকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামে অভিহিত করা হতো। উদাত্ত ছিল সর্বোচ্চ স্বর, অনুদাত্ত নিচু স্বর এবং স্বরিত উদাত্ত-অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বর। সংগীতজ্ঞগণ বলেন যে, এই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যেই সাতটি স্বরের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন– উদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ছিল গান্ধার ও নিষাদ; অনুদাত্ত স্বরের অন্তর্গত ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত স্বরের অন্তর্গত ছিল ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম। এই তিনটি আদি স্বর থেকেই পরবর্তীকালের সাত স্বরের উদ্ভব হয়েছে।

(গ) **বৈদিকোত্তর যুগ**: বৈদিক যুগকে অনেকে বলেন অতি প্রাচীন যুগ। সংগীতের চর্চা যে এই যুগেও অব্যাহত ছিল তা বোঝা যায় এই যুগের গ্রন্থে সংগীতের উল্লেখ দেখে। এদের মধ্যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' নারদের 'সংগীত মকরন্দ' ও 'নারদীয় শিক্ষা', মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' ইত্যাদি গ্রন্থে এই যুগের সংগীতের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের তামিল গ্রন্থ 'পারিপাডল'-এ সংগীত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীর বৌদ্ধ নাটক 'সিলাপহিগারম' গ্রন্থে গীত এবং বিভিন্ন বাদ্যের উল্লেখ আছে।

ভারতের সময়কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। অনেকের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'নাট্যশাস্ত্র' লেখা হয়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে 'রাগ' নামটির কোনোও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি ষড়জ এবং মধ্যম গ্রামের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা, নৃত্য, নাট্য ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বিকৃত স্বরগুলোর মধ্যে ভরত মাত্র দুটো স্বরের উল্লেখ করেছেন– 'অন্তর গান্ধার' ও 'কাকলী নিষাদ'। সংগীত সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয় ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থকে।

'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'রাগ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। মতঙ্গও গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেছেন এবং গ্রাম মূর্চ্ছনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনিও সাতটি জাতির উল্লেখ করেছেন; টকী, সাবীরা, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, বট্টরাগ, হিন্দোলক এবং টক্ককৌশিক।

এর পরেই সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে নারদের 'নারদীয় শিক্ষা'। এই গ্রন্থে শ্রুতি, স্বর ইত্যাদির উল্লেখ আছে এবং তিনি সাতটি গ্রাম রাগের বর্ণনা করেছেন।

নারদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সংগীত মকরন্দ'-এ প্রথম রাগ-রাগিণীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ যুগের অন্যান্য গ্রন্থাদির মধ্যে পুণ্ডরীক বিটঠ্‌লের ৪টি গ্রন্থ 'রাগমালা', 'রাগমঞ্জরী', 'নর্তন নির্ণয়' ও 'সদ্রাগ চন্দ্রোদয়'; দামোদরের 'সংগীতদর্পণ', সোমনাথের 'রাগবিরোধ, অহোবলের 'সংগীত পারিজাত', ব্যাঙ্কটমুখীর 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা', হৃদয়নারায়ণ দেবের 'হৃদয় প্রকাশ' ও 'হৃদয় কৌতুক'; পণ্ডিত ভাবভট্টের 'অনুপবিলাস', 'অনুপঙ্কুশ' এবং 'অনুপসংগীত রত্নাকর', শ্রীনিবাসের 'রাগতত্ত্ববিবোধ' উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগে সংগীতের অভাবিত প্রসার এবং উন্নতি হয়েছিল। একদিকে যেমন ছিলেন দিকপাল সংগীতজ্ঞরা, অপরদিকে সংগীতের সকল বিভাগ অর্থাৎ নৃত্য, গীত এবং বাদ্য নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়েছিল। এ-যুগে মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

১১শ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮শ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগীতের ইতিহাস মধ্যযুগ বা মুসলমান যুগ বিবেচনা করা হলেও এর অনেক আগেই উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু বিজয় ও একাদশ শতকে মুহম্মদ ঘোরীর আগমনের মধ্য দিয়ে সংগীতের ওপর মুসলমান সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। বিজয়ী মুসলমানদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা অনেক প্রকার আরব্য-পারসিক ও তুর্কি বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং যেগুলোর সাথে উপমহাদেশীয় সংগীতের সাদৃশ্য ছিল। মুসলমানদের প্রভাবে ভারতীয় সংগীত এক নতুন রূপ লাভ করে। আধুনিককালে পাশ্চাত্যের প্রভাব যেমন বিভিন্ন শৈলীর গানে শোনা যায়, মুসলমান বিজয়ের ফলে ভারতীয় সংগীতের অনুরূপ নানা পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই সময়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্ষেত্রে শৈলীগত পরম্পরার বিকাশে ঘরানার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে।

সংগীতের উন্নয়নে সাধনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অসাধারণ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এই মধ্যযুগে। এই সময়ে সংগীতজ্ঞদের মধ্যে গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে রয়েছেন পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব, পার্শ্বদেব, কবিলোচন, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, কল্লিনাথ, অহোবল, ব্যাঙ্কটমুখী, সোমনাথ, দামোদর, কোহল, রামামাত্য, শ্রীনিবাস, হৃদয় নারায়ণ দেব, ভাবভট্ট প্রমুখ সংগীতশাস্ত্রী। অন্যদিকে সংগীত পরিবেশনায় সিদ্ধ সাধকগণের মধ্যে রয়েছেন— আমীর খসরু, বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, রাজা মানসিংহ তোমর, সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী, স্বামী হরিদাস, তানসেন, জগন্নাথ কবি রায়, বিলাস খাঁ, নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ), অদারঙ্গ, মনরঙ্গ, গোলাম রসুল, গোলাম নবী (শোরী মিঞা), কাশিম আলী খাঁ, বাহাদুর সেন প্রমুখ।

শাস্ত্রীয়সংগীতের উন্নয়ন ও বিকাশে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দিল্লীর সুলতান থেকে শুরু করে রাজা-মহারাজা, সামন্ত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ-দরবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে সংগীত প্রসার লাভ করেছিল।

শার্ঙ্গদেব

মধ্যযুগে সংগীতের ইতিহাসে যে কয়জন সংগীতশাস্ত্রবিদ তাঁদের কীর্তির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব (এয়োদশ শতক) অন্যতম। প্রাচীনকালের সংগীত গ্রন্থ 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র' যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মধ্যযুগে শার্ঙ্গদেব রচিত 'সংগীত-রত্নাকর' ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। দেবগিরি রাজ্যের রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় (১২১০-১২৪৮ খ্রি.) গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত– স্বর, রাগ, তাল, বাদ্য ও নৃত্য। এই গ্রন্থে গন্ধর্ব ও প্রাচীন ধারার সংগীতকে ব্যাখ্যা করে নতুন ধারার সংগীত পদ্ধতির পূর্ণ তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করেছেন শার্ঙ্গদেব। গ্রন্থটিতে সংগীতের নানা বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায় যেমন– নাদের উৎপত্তি, স্বরূপ, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা, জাতি, তত্, শুষির, আনদ্ধ, ঘন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা, নৃত্যকলা ইত্যাদি।

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনামল (রাজত্বকাল: ১২৯৬-১৩১৬)

আলাউদ্দিন খিলজি একজন বিচক্ষণ, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনামলে শাস্ত্রীয় ধারায় আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চল সে সময়ে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পীদের আবাসভূমি বলে পরিচিত ছিল। নায়ক গোপালসহ বহু সংগীতবিদ, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতবর্গ এই বিজয়ের ফলে রাজদরবারে সমাদৃত হন। তাঁর রাজদরবারে প্রতিভাবান সংগীতগুণি- আমীর খসরু, বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল প্রমুখের উপস্থিতির কারণে হিন্দু-মুসলিম সংগীত ধারার সমন্বয় সাধন হয়।

আমীর খসরু ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতের একজন যুগস্রষ্টা প্রতিভা। তিনি এই উপমহাদেশের প্রচলিত সংগীত ধারার সাথে আরবি, ফার্সি ও তুর্কি সংগীত ধারার সংমিশ্রণে এক অভিনব ও প্রশংসিত বিপ্লব আনেন।

নায়ক গোপাল (১২০৫-১৩১৫)

সংগীতের ইতিহাসে গোপাল নায়ক ও নায়ক গোপাল অভিন্ন ব্যক্তি কি-না এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'মআদনুল মৌসিকী' গ্রন্থের রচয়িতা হাকিম মোহাম্মদ করম ইমাম গোপাল নায়ক ও নায়ক গোপালকে ভিন্ন দুজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকের অনুমান গোপাল নায়ক ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংগীতজ্ঞ ছিলেন। নায়ক তাঁর বংশগত উপাধি। 'নায়ক' উপাধি উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। তাই অনুমিত হয় গোপাল দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি অঞ্চলের রাজা রামদেব যাদবের সভাগায়ক ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মল্লিক কাপুর গোপাল নায়কের গায়নশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। তখন আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লীর সুলতান। আলাউদ্দিন খিলজি রামদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। নায়ক গোপাল আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন।

আবার কোনো কোনো সংগীতজ্ঞের মতে, গোপাল নায়ক চতুর্দশ শতাব্দীর সংগীতগুণি এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল বিজয় নগর রাজসভা। তবে সংগীতে গোপাল নায়কের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বহু রাগের স্রষ্টা, যেমন– পটমঞ্জরী, যোগিয়া, পিলু, বড়হংস, সারং ইত্যাদি। 'রাগকদম্ব' গ্রন্থ ও নতুন গীত রচনার পাশাপাশি নতুন গায়কীর প্রবর্তন করেছিলেন নায়ক গোপাল।

বৈজু বাওরা

বৈজু নামে একাধিক সংগীতজ্ঞের নাম প্রচলন আছে এবং প্রচলিত সকল বক্তব্যই কিংবদন্তিতে আচ্ছন্ন। তবে বৈজু বাওরা বা নায়ক বৈজু নামে খ্যাত ব্যক্তিই পরবর্তীকালে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করে। তিনি ত্রয়োদশ শতকে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে জীবিত ছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজি তাঁকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণও করেছিলেন। তবে বৈজু স্থায়ীভাবে দরবারে অবস্থান না করলেও মাঝে মাঝে দরবারে যেতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও নায়ক বৈজু ও বৈজু বাওরা বলতে দু'জন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। একজন হচ্ছেন আলাউদ্দিন খিলজির সময়কার নায়ক বৈজু অপরজন রাজা মানসিংহ তোমরের সময়কার বৈজু বাওরা। নায়ক বৈজুকে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এবং বৈজু বাওরাকে ধ্রুপদের স্রষ্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে নায়ক বৈজু এবং বৈজু বাওরাকে আজকাল একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। বৈজু সুকবি ছিলেন। তিনি বহু ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন যার অতি সামান্যই কালে কালে রক্ষা পেয়েছে। উদাসীন বা সন্ন্যাসী প্রকৃতির ছিলেন বলে তাঁকে 'বৈজু বাওরা' বলা হতো।

সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী (১৪৫৮-১৪৯৯)

আরব্য-পারসিক ও তুর্কি সংগীত রীতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীত ধারায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার প্রধান ধারক ও বাহকদের মধ্যে জৌনপুরের শেষ স্বাধীন নবাব সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী অন্যতম। তিনি 'বড়ো খেয়াল' (বিলম্বিত লয়ে গীত) গায়ন রীতির উদ্ভাবন করেন। তিনি রাগাঙ্গ রাগের আধারে শ্যাম-রাগাঙ্গের প্রকরণ হিসেবে মল্‌হার শ্যাম, গৌড় শ্যাম, ভূপাল শ্যাম প্রভৃতি বারো প্রকার শ্যাম রাগের উদ্ভাবন করেন। অনুরূপ টোড়ি রাগাঙ্গের 'জৌনপুরী টোড়ি' বা 'হুসেনী টোড়ি' জনপ্রিয় করেন।

রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৩-১৫১৭)

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর সংগীতের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসেবে বখসু, বৈজু, ভন্নু, চরজু, ধোন্ডু, রামদাস প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা মানসিংহ তোমর ধ্রুপদ গানের সংস্কার করে যুগোপযোগী করেন। সংগীতজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে 'মানকুতুহল' নামে একটি বিশাল সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তাঁর স্বরচিত গানও ছিল। তাঁর স্ত্রী, রাণী মৃগনয়নীও সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন এবং তিনি 'গুর্জরী টোড়ী' রাগটি সৃষ্টি করেন। রাজা মানসিংহ নিজেও কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর অপর একজন প্রসিদ্ধ সংগীত শাস্ত্রকার ছিলেন লোচন। তিনি 'রাগতরঙ্গিণী' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সংগীতের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতীয় রাগসংগীতের ধারায় লোচন পণ্ডিত ওই যুগের বিশিষ্ট নাম।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫)

মধ্যযুগে মুঘল শাসনামলে শাস্ত্রীয়সংগীতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এই উন্নতির মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সম্রাট আকবর। ঐতিহাসিক আবুল ফজল আকবরের দরবারে প্রায় ছত্রিশজন সংগীতজ্ঞের তালিকা করেন। ধ্রুপদ শৈলীর স্বর্ণযুগ খ্যাত তাঁর রাজত্বকাল সংগীতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে পরিচিত। এই যুগের শ্রেষ্ঠতম সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেন রাজদরবারের নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন। তাঁর সংগীত পরিবেশনা অদ্যাবধি কিংবদন্তি এবং তানসেনী যুগ হিসেবে প্রশংসিত। তানসেন প্রবর্তিত সংগীত-রীতি 'সেনী ঘরানা' নামে প্রচলিত হয়। তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি রাগের নাম হলো– দরবারী কানাড়া, মিঞা-কী-মল্লার, মিঞা-কী-সারং ইত্যাদি।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার পূর্বধারাই অব্যাহত ছিল। দরবারের সংগীতবিদদের মধ্যে লাল খাঁ, হাফিজ আলী, তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ, মির্জা জুলকার নাইন, ছত্তর খাঁ, জাহাঙ্গীর দাদ, খুররম দাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পণ্ডিত ব্যঙ্কটমুখী রচিত 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' গ্রন্থ রচিত হয়। ব্যঙ্কটমুখীর 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' রাগ-বর্গীকরণের মেল বা ঠাট পদ্ধতির আলোকে অদ্যাবধি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল (১৬২৮-১৬৫৮)

সম্রাট শাহজাহান অত্যন্ত শিল্পানুরাগী ছিলেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত সকল বিভাগেই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার অসাধারণ কীর্তি অদ্যাবধি প্রশংসিত। ফকিরুল্লার 'রাগদর্পণ' থেকে জানা যায়, শাহজাহানের দরবারে ত্রিশজন গায়ক-বাদক ছিলেন। মানসিংহ তোমর প্রবর্তিত 'ধ্রুপদ' শৈলী ও হুসেন শাহ শর্কী প্রবর্তিত 'খেয়াল' এসময়ে জনপ্রিয় ছিল। তাঁর দরবারের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন– শেখ বাহাউদ্দিন, মিয়া দালু, শের মুহম্মদ, দিরঙ্গ খাঁ, লাল খাঁ, খুশহাল খাঁ, জগন্নাথ কবিরায়, গুণসেন, রঙ্গ খাঁ, মুহির খাঁ গুজরাটী, বসন্তী কলাবন্ত, সুবল সেন, মিছরি খাঁ প্রমুখ। সম্রাট শাহজাহান সংগীতজ্ঞদের কৃতিত্বের জন্য কবিরায়, গুণ-সমুদ্র, নায়কই-আফজাল ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন।

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) ও সম্রাট বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১১)

আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহর রাজত্বকালে সংগীতের রাজদরবারকেন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ভাবভট্ট রচিত কয়েকটি সংগীত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- 'অনুপসংগীত' রত্নাকর', 'অনুপপসংগীত বিলাস', 'অনুপসংগীতাঙ্কুশ', 'মুরলী প্রকাশ', 'নষ্টোদিষ্ট প্রবোধক', 'ধ্রুপদের টীকা', সংগীতবিনোদ'। তাঁর গ্রন্থগুলো সংগীতের পূর্বাচার্যদের অনুকরণ হলেও এতে ধ্রুপদ গায়নরীতির সুষ্ঠু পরিচয়, নানাবিধ রাগের সমসাময়িক বর্ণনাদি, অনুপসংগীত রত্নাকরে ২০টি মেলকে আশ্রয় করে রাগ-বর্গীকরণ করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮)

বাহাদুর শাহ্র পৌত্র মুহম্মদ শাহ্ একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পর তিনিই সর্বশেষ সংগীতপ্রেমী মোগল সম্রাট। তাঁর রাজত্বকাল খেয়াল শৈলীর বিকাশের জন্য ইতিহাসখ্যাত। তানসেনের দৌহিত্র বংশের লাল খাঁর পুত্র নিয়ামত খাঁ (১৬৭০) ওরফে 'সদারঙ্গ' রচিত খেয়াল বন্দিশে মুহাম্মদ শাহ (রঙ্গিলে) নাম নিয়ে একত্রে 'সদারঙ্গীলে' ভণিতাযুক্ত বন্দিশ, খেয়াল শৈলী বিকাশের সাক্ষী হিসেবে অদ্যাবধি বিখ্যাত ও প্রচলিত। 'সদারঙ্গ' বীণাকার তথা ধ্রুপদ ও ধামার গায়ক ছিলেন। সদারঙ্গ সহস্রাধিক খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার বন্দিশ রচয়িতা ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে চিরস্মরণীয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে অদারঙ্গের জন্ম। তাঁর আসল নাম ফিরোজ খাঁ। অদারঙ্গ, মুহম্মদ শাহ্র সভাগায়ক ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট রাগ ফিরোজখানী টোড়ি বহুল প্রচলিত ছিল। অদারঙ্গ বীণাবাদ্যের উন্নয়ন এবং কণ্ঠসংগীতের অনুকরণে যন্ত্রে আলাপচারিতা প্রচলন করেন।

আধুনিক কালের প্রারম্ভে বা প্রথমার্ধে বা প্রাক-আধুনিক যুগে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম দুই-তিন দশক পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভিক পর্বে সংগীতের স্রোত কিছুটা মন্থর হয়ে আসে। কিন্তু সংগীতের অগ্রগতির দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি, স্তিমিত হয়েছিল মাত্র। জয়পুরের মহারাজা প্রতাপসিংহ (১৭৭৯-১৮০৪ খ্রি.) একটি সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে সারা ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের সেই সম্মেলনে আহ্বান করে। তাঁদের সহায়তায় 'সংগীতসার' নামে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে বিলাবলকে শুদ্ধ ঠাট বলে স্বীকার করা হয়।

১৮১৩ সালে পাটনার রইস মুহম্মদ রজা সাহেব 'নাগ্মাতে আসফী' সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বিলাবলকেই শুদ্ধ ঠাট বলে সর্বপ্রথম প্রচার করেন এবং প্রাচীন রাগ-রাগিণী পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী নির্ধারিত করেন। আধুনিক যুগের উত্তরপর্বে সংগীতসাধক পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্করের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষপর্ব শেষ করে ভাতখণ্ডে লুপ্তপ্রায় হিন্দুস্তানি সংগীতের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই সর্বপ্রথম ১০ ঠাট পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এই পদ্ধতি আজ সমগ্র উত্তর ভারতে স্বীকৃত ও প্রচলিত। তিনি একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথা– 'হিন্দুস্তানি সংগীত পদ্ধতি' (ক্রমিক পুস্তকমালিকা) (৬ খণ্ড), 'লক্ষসংগীত', 'অভিনব রাগমঞ্জরী', 'সংগীতশাস্ত্র' (৪ খণ্ড) ইত্যাদি।

বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও সংগীত প্রচারার্থে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন এবং প্রথমে লাহোরে ও পরে মুম্বাই নগরীতে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' নামে সংগীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর লিখিত একাধিক পুস্তকের মধ্যে 'রাগপ্রবেশ', 'সংগীত তত্ত্ব দর্শক', 'ভজনামৃত লহরী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বা প্রথম ভাগ থেকে বর্তমান যুগের শুরু। ষোড়শ শতাব্দীকে যেমন ধ্রুপদ শৈলীর স্বর্ণযুগ বলা যায় তেমনি বিংশ শতাব্দীকে খেয়াল শৈলীর স্বর্ণযুগ বলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঠুমরি গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত অযোধ্যার রাজ্য শাসন করেন। ঠুমরি গানের কেন্দ্রভূমি ছিল লক্ষ্মৌ। রাজ্য শাসনের চেয়ে গান-বাজনার প্রতি তিনি অধিক অনুরক্ত ছিলেন।

ওয়াজেদ আলী শাহ্ 'আখতার পিয়া' ছদ্মনামে অনেক ঠুমরি রচনা করেন। ঠুমরি গানের সময়ে শাস্ত্রীয়সংগীতের টপ্পা শৈলীটিও লক্ষ্মৌ রাজদরবারে থাকাকালে গোলাম নবী ওরফে শৌরী মিঞা প্রবর্তন করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে রাগসংগীতের রেকর্ড সহজলভ্য হয়। ফলে বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের গান বাণিজ্যিকীকরণ হতে থাকে। ঘরানার পরিবর্তে সংগীতজ্ঞদের বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং সংগীত শিক্ষার উদার প্রভাব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়। ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই সংগীতের একাডেমিক শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। এ-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরানাদার শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর, ওমকারনাথ ঠাকুর, নারায়ণরাও পটবর্ধন, শংকররাও পণ্ডিত প্রমুখ সংগীতজ্ঞ এবং তাদের শিষ্য-প্রশিষ্য বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

খেয়ালের ঘরানাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে দুর্বল হলেও ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গায়কীর দৃষ্টিতে এসব ঘরানার উপযোগিতা বর্তমানে গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য।

লোকসংগীত

সাধারণত জনশ্রুতিমূলক গানকে লোকসংগীত বোঝায়। অর্থাৎ যে গান শ্রুতি এবং স্মৃতি নির্ভর করে প্রবহমান নদীর ধারার মতো বহমান তাকেই লোকসংগীত বলা হয়। লোকসংগীতের আদি উদ্ভব প্রাগৈতিহাসিক মানব সমাজে। প্রকৃতির মায়া ঘেরা অনাবিল সৌন্দর্যের অন্তর্গত এই লোকসংগীত যেকোনো লোকের কাছে অতি প্রিয় এবং আকর্ষণীয়।

লোকসংগীত মূলত গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এতে একদিকে রয়েছে আঞ্চলিক মানস সংগঠনের পরিচয় এবং অন্যদিকে পল্লিগ্রামের চারপাশের পরিবেশনের ধ্যান-ধারণা। লোকসংগীত আধুনিক যেকোনো সংগীতের মতোই বাণী ও সুরের সমন্বিত রূপ। তবে এই সংগীতের বাণী ও ভাষা আঞ্চলিকতায় পরিপূর্ণ এবং সুরও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবার সময় ও স্থানের পরিবর্তনে লোকসংগীতের বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আসে। আবার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে এই গানের কাঠামোগত পরিবর্তন আসে।

লোকসংগীত সাধারণত একটিমাত্র ভাব বা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে কাহিনিভিত্তিক লোকগীতির সংখ্যাও কম নয়। এগুলো কাহিনি ও বর্ণনা গানের সমন্বয়ে গঠিত। লোকগীতি বা লোকসংগীত সাধারণত লিখিত নয় বলে একজন মানুষের কণ্ঠ থেকে ভিন্ন মানুষের কণ্ঠে একই সংগীত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আবার সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে গানেরও কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে। এমনিভাবে লোকগীতি বা লোকসংগীত পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি পরিবর্তিত হচ্ছে। মুখে মুখে গান রচনা করলেও লোকসংগীত রচয়িতার সামনে থাকে তার আপন পারিপার্শ্বিক ভুবন, যেমন–নদ-নদী, খাল বিল, মাঠ-ঘাট, বন-বনানী, উদার নীল আকাশ, জীব-জন্তু ও ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য।

লোকসংগীত সর্বদাই যৌথ সৃষ্টি। ফলে ব্যক্তিগত রচয়িতার খোঁজ পাওয়া যায় না। লোকসংগীত এবং পল্লিগীতির মধ্যে এখানেই খানিকটা পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–পল্লিগীতি রচয়িতা ও সুরকারের পরিচয় বা সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু লোকসংগীত রচয়িতা এবং সুরকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় যে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসা গানই লোকসংগীত। কেননা, এখানে অনেক সময় রচয়িতা এবং সুরকারের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের লোকসংগীত ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গান। যেমন– ভাটিয়ালি, জারিগান, সারিগান, বারোমাসি, কবিগান, কীর্তন, বাউলগান, ধূয়াগান, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, ঝুমুরগান, পাঁচালি, জাগগান, বিয়ের গান, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভাণ্ডারী, গাজীরগান, চট্‌কা গান, ভাদু গান, টুসু গান, ময়মনসিংহগীতিকা ইত্যাদি।

ভাটিয়ালি গান

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে ভাটিয়ালি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভাটিয়ালি গান নদীবহুল বাংলাদেশের আদিবাসীদের সৃষ্টি। এই গানের সুর অতি সহজেই সরলপ্রাণ মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। নৌকার মাঝির কণ্ঠে ভাটির টানে নৌকা নিয়ে চলার সময় যে সুর বের হয়ে আসে সেটাই ভাটিয়ালি সুর। ভাটিয়ালি গান নদীর গান। নদীর যোগাযোগের মাধ্যম হলো নৌকা। ভাটিয়ালি শব্দটির সাথে নদীর স্রোত ভাটির দিকে প্রবাহিত হওয়ার একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। ভাটির টানে যখন নৌকা চলে তখন মাঝিকে শ্রম দিতে হয় না। তখন সে লম্বা টানে দরাজ কণ্ঠে এই গান গাইতে থাকে। এ গান প্রধানত

ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি মনের বেদনা ও সুখ-দুঃখের চিত্র এ গানের বিষয়বস্তু। ভাটিয়ালি গানের বাণী নদীকেন্দ্রিক, এই গানের সুর নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। আধুনিক যুগে বেতার, টেলিভিশন এমনকি ছায়াছবিতেও ভাটিয়ালি গান পরিবেশিত হচ্ছে। ভাটিয়ালি গানের উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

ভাটিয়ালি গানের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারায়। আধুনিক সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন ভাটিয়ালি গানের মাধুর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' নজরুল লিখেছেন 'আমার গহীন জলের নদী' আবার পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন 'নদীর কূল নাই কিনার নাইরে' ইত্যাদি।

ভাটিয়ালি গানের প্রধান উৎপত্তি স্থল সিলেট ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চল। পরে এ গানের বিস্তৃতি ঘটে অন্যান্য নদী বহুল এলাকায়। যেমন– ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লার পশ্চিম অঞ্চল, চাঁদপুর, মতলববাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে।

জারিগান

বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি মূল্যবান সম্পদ হলো জারিগান। জারি শব্দের অর্থ কান্না বা শোক। একটি সমন্বিত কাহিনি এ গানের বৈশিষ্ট্য। প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনাকে এখানে বর্ণনা করা হয়। তবে কারবালার প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচিত হতে দেখা যায়।

অনুমান করা হয়, সামন্তযুগের গোড়ার দিক থেকেই শক্তিমান শাসকের জয়-পরাজয় প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য কবিরা এ ধরনের গান রচনা করা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে ইসলামের বীরত্ব, ত্যাগ ও প্রেম-কাহিনি আরবি-ফারসি সাহিত্যের পথ ধরে আবেগপ্রবণ বাঙালি সমাজে প্রচারিত হয় এবং গ্রাম্য চারণ কবিরা তাদের মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেন বীরগাথা, করুণ গাথা ও প্রেম গাথা। যেমন: কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে রচিত হয় 'মর্সিয়া জারি', আইয়ুব নবী ও তার বিবি রহিমাকে নিয়ে রচিত হয় 'আইয়ুব নবীর জারি'এবং নবী ইব্রাহীম খলিলুল্লাহকে নিয়ে রচিত 'কোরবানীর জারি'।

জারিগান সাধারণত বিভিন্ন আসরে পরিবেশিত হয়। আসরে জারির সাথে ধুয়া, পাঁচালি, ছড়া ইত্যাদি সহকারে পরিবেশিত হয়। জারিগানের সুর নির্দিষ্ট কিন্তু কথা বা বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট নয়। নাচ সহযোগে জারিগান পরিবেশিত হয়। একজন মূল গায়ক বা বয়াতী গানের ভেতর দিয়ে কাহিনি পরিবেশন করেন, সাথে সহযোগী গায়ক ধুয়া ধরে গানকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। জারি গায়কগণ শোকের প্রতীক হিসেবে গায়ে কালো পোশাক ও হাতে রুমাল ব্যবহার করেন। যেমন– ইসমাইলের কোরবানির জারি-

এক রোজ খলিলুল্লাহ্ নিদ্রাতে ছিল
ঘুমের ঘোরে খোদা তাকে কহিতে লাগিল
আল্লা বলে ইব্রাহীম শোন আমার বাণী।
আমার নামেতে তুমি করহ কোরবানী ॥

সারিগান

সারিগান লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা। সাধারণভাবে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে যে গান গায় তাকেই সারিগান বলা হয়। এ গানে প্রধান তাৎপর্য হলো সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে কাজ করার সময় এই গান গাওয়া হয় অর্থাৎ কর্ম যেখানে সারিগান সেখানে।

সারিগান মূলত নৌকা বাইচের গান। নৌকা বাইচের সময় সারিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চল বিশেষ করে পূর্ব ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও পাবনা নৌকা বাইচের জন্য প্রসিদ্ধ। এ গান নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিজ সৃষ্টি। আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের বিচিত্র রকমের নৌকা তৈরি হতো। চলন্ত নৌকার বৈঠার তালে তালে কথা সাজিয়ে আদিম সমাজ থেকেই বাংলায় সারিগানের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাইচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর তিনটি স্তর থাকে। যেমন: নৌকা ছাড়ার বন্দনা গান, বাইচ শুরু হলে উদ্দীপনামূলক সারিগান এবং সব শেষে বিদায় সংগীত। গানগুলো গ্রাম্য কবিদের রচিত। সারিগান নিম্নরূপ:

ভাইরে শালটি কাঠের ডিঙ্গাখানি
কড়ি কাঠে দাঁড়
জমসের আলীর বাইচের নৌকা
গলাত সোনার হার।

বারোমাসি

বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকাঙ্ক্ষা-নিরাশার কথা বারোমাসি গানে বর্ণনা করা হয়। বারোমাসি গান প্রত্যেক মাসের বর্ণনা দেওয়া হয় বলে বারোমাসি গান। এই গান শুরু হয় সাধারণত বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয় চৈত্র মাসের বর্ণনা দিয়ে। এ গানের বর্ণনাকার অধিকাংশ সময়েই নারী, যে বারোমাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ তার দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বলে। বারোমাসি গানের উদাহরণ নিম্নরূপ:

জ্বালাইলে যে জ্বলে আগুন
নিভানো বিষম দায়।
আগুন জ্বালাইসনা আমার গায়।

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বারোমাসি গান জনপ্রিয়। বারোমাসি গানগুলো সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

কবিগান

বাংলাদেশের লোকসংগীতের এক বিশিষ্ট ধারার নাম কবিগান। অনুমান করা হয়, রচনা শক্তি, সুর, লয়, তাল, অলংকার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও বাক্য বিন্যাসে পারদর্শী বলে এই গানের স্রষ্টাকে কবিয়াল বলে সম্বোধন করা হয়। বাক্যবিন্যাস, যথার্থ শব্দ প্রয়োগ, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এই গানের স্রষ্টা। জনপ্রিয় কোনো ঘটনা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধ কাহিনি এবং ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে এই গান তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করা হয়। কবিগান এমন এক ধরনের গান যা সৃজনশীলতা, কবি প্রতিভা এবং সংগীত সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয়।

কবিগান দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসরে প্রশ্নোত্তর ও জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদলে একজন করে দলপতি থাকেন। কয়েকজন গায়ক থাকেন সহযোগিতাকারী হিসেবে। তাদের বলা হয় দোহার। তারা প্রধানত ধুয়া অংশটুকু গেয়ে থাকেন। ঢোল ও কাঁসর এ গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র।

আঠারো শতকের দিকে কবিগানের পূর্ণ সমৃদ্ধি ঘটে। কবি গানের বিষয় পৌরাণিক হলেও এর প্রসার ঘটেছে আধুনিক কালে। এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেছে সমসাময়িক অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়াদি। এ ব্যাপারে চট্টগ্রামের কবি রমেশ শীল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রমেশ শীল কবিগানকে আধুনিক ও প্রগতিশীল জীবন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর গান হয়ে ওঠে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের বাণী প্রচারের প্রতীক। এতদিন কবিগান যদিও পৌরাণিক বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু আধুনিক কালে কবিগান জোতদার বনাম কৃষক, মহাজন বনাম খাতক, এমনকি ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়কে কবি লড়াইয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হচ্ছে।

বাউলগান

বাউলগান বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি প্রধান ধারার নাম। বাউল সাধকদের দ্বারা রচিত গানকেই বলা হয় বাউলগান। বাউল সাধনার মূল বিষয় হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আওতাভুক্ত না থেকে স্রষ্টার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। বাউল সম্প্রদায় এক প্রকার অধ্যাত্মবাণী ও উদার মানবতাবাদী সম্প্রদায় হিসেবেও পরিচিত। বাউল সাধনার মাধ্যমে প্রেমের নৈকট্যের মধ্য দিয়ে অসীমের সীমাকে আয়ত্তে আনেন। বাউলগানে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচারিত হয়। মানুষ তাদের কাছে বড়ো।

বাউলগানের মধ্য দিয়ে বাউলদের ধর্ম ও শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তুগুলো প্রকাশিত হয়। সাধারণত বাউলরা গানের কথার মাধ্যমে তাদের তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করে। প্রায় সকল বাউলগানেই দেখা যায় সহজিয়া বাদ এবং শূন্যবাদের কথা। বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্রাট লালন শাহ। লালন ছিলেন উদার মানবতাবাদী। লালনের ধর্ম ছিল মানব ধর্ম। মধ্য যুগের বৈষ্ণব কবি যেমন গেয়েছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। তেমনি বাউল সম্রাট লালনের কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না।

বাউল শুধু গান নয়, এক প্রকার সুরও। রবীন্দ্রনাথ এই সুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের মধ্যে বাউল সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

খঞ্জরি, ডুগডুগি, খমক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে বাউলগান-গাওয়া হয়ে থাকে।

যদিও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বাউলগান প্রভাব বিস্তার করেছে তবুও কুষ্টিয়া জেলায় এ গানের বিকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। বাউল গান নিম্নরূপ:

১। পাখি কখন জানি উড়ে যায়।
একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।
২। কেন জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা দেখায় আসমানে
খোদা আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
কেউ নাহি তার সন্ধান জানে।

জাগগান

জাগগান গল্প বা কাহিনিমূলক। লোকজীবনে প্রচলিত গল্প কাহিনি এ গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। রাত জেগে এই গান গাওয়া হয় বলে এই গানের নাম জাগগান। রংপুর অঞ্চলে জাগগানের বিশেষ প্রচলন আছে।

অনেক সময় প্রচলিত জনশ্রুতির পীর-দরবেশ ও সাধু-ফকিরদের মাহাত্ম এ গানে বর্ণিত হয়। আবার অনেক সময় রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য দেবকে নিয়েও এই গান রচিত হয়। পৌষ মাসে ফসল ঘরে ওঠে গেলে কৃষক একটু অবসর পায় এবং তখন ফসল ওঠার পর মাঠ শুকনো থাকে। এ সময়ই গ্রামে জাগগানের আসর বসে।

বিয়েরগান

বিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিয়েরগান ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক গীতি পর্যায়ের গান। বিয়ে কেবল একটি ব্যক্তিগত কিংবা শুধু পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেই এই আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

বিয়েকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলো যেমন: পানচিনি, গায়ে হলুদ, মেহেদি তোলা, বর স্নান, বরণ ডালা ইত্যাদি এসব অনুষ্ঠানের প্রতিটিতেই গান পরিবেশন করা হয়। এইভাবে প্রত্যেক বিয়ের প্রত্যেক আচার-অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক বিয়ের গান পরিবেশন করা হয়। বিয়ের গান নিম্নরূপ:

হলুদ মাখিয়া অঙ্গে
দেখেক চক্ষু তুলি
ওরে কান্দিয়া পোহাইস নিশি তুই।
কারবা হিয়া বুলিরে
ওরে পেন্দেক হলদি অঙ্গ ভরি।

মুর্শিদি

মুর্শিদিগানের উৎপত্তি স্থল চট্টগ্রাম। পরে এর প্রসার ঘটেছে নোয়াখালি ও কুমিল্লা। দেশের অন্যান্য এলাকায়ও কমবেশি মুর্শিদি গানের প্রচলন দেখা যায়। মুর্শিদ অর্থ পথ প্রদর্শক। যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যস্থকারী। আরবি ইরশাদ শব্দটির অর্থ নির্দেশ। যিনি ইরশাদ বা নির্দেশ দেন তাকে মুর্শিদ বলে। সে অর্থে মুর্শিদকে গুরু বলা যেতে পারে। এই মুর্শিদ বা গুরুর প্রতি ভক্তিবিষয়ক সংগীতই হলো মুর্শিদিগান। সুফি-সাধকগণ এই গীতধারার স্রষ্টা। মুর্শিদিগান নিম্নরূপ:

ও মুরশিদ পথ দেখাইয়া দাও
আমি যে পথ চিনিনা গো
সঙ্গে কইরা নাও ॥

মারফতি

মারফত শব্দের অর্থ মাধ্যম। স্রষ্টাকে প্রেমের মাধ্যমে অর্জনই এর মূল লক্ষ্য। এই পথের মতাদর্শীরা সাধারণ মানুষের চিন্তা ও চেতনার অনেক উর্ধ্বে। নিরাকার সৃষ্টিকর্তাকে বিধিবদ্ধ সাধারণ নিয়ম বা উপাসনায় অর্জন নয়, প্রেমের মধ্য দিয়ে আশেক ও মাশুকের সম্পর্কের মাধ্যমে তাকে অর্জন করাই এর উদ্দেশ্য। এই পথ মতে স্বর্গের লোভ মুখ্য নয়, মুখ্য স্রষ্টার সান্নিধ্য। তবে এই মতের মতাদর্শ বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে একজন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, তিনিই 'মুরশিদ', এই মতের জ্ঞানতাপস তিনি। তিনিই স্রষ্টাকে পাওয়ার প্রেমের পথের শিক্ষা দেন। স্রষ্টাকে অর্জনের চারটি পথ আছে, পর্যায়ক্রমে শরিয়ত, তুরিকত, হকিকত ও মারফত। সবচেয়ে উর্ধ্বে হলো মারফত, তবে এ পথে গোপনীয়তা বেশি। আত্মশুদ্ধি ও আত্মার উৎকর্ষতা এবং উন্নতির মধ্য দিয়ে মানুষ পৌঁছে যেতে পারে অভিষ্ট লক্ষ্যে। তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোনো ভেদ থাকে না। প্রেম ও সাধনায় সৃষ্টি জয় করে স্রষ্টাকে। এই জয়ের পথ প্রদশর্ক 'মুরশিদ। তিনিই মাধ্যম, তাকে জয় করা অর্থই পরমাত্মাকে জয় করা।

মাইজভাণ্ডারী

মাইজভাণ্ডারী এক প্রকার অধ্যাত্মিক গান। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার একটি গ্রামের নাম মাইজভাণ্ডার। মাইজভাণ্ডার গ্রামের নামানুসারে এই গানের নামকরণ করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী গান ও তরিকার মূল ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্। তিনি এখন থেকে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে (১৮২৬ খ্রিঃ) মাইজভাণ্ডার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার তরিকার মূল বিষয় হচ্ছে সংযম-সাধনা। অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা, বিলাস বৈভব পরিহার করা এবং সমালোচনাকারীদের শত্রু না ভেবে উপকারী বন্ধু ভেবে আত্মশুদ্ধি করা। ১৯০৬ সালে ৭৯ বৎসর বয়সে এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন।

মাইজভাণ্ডার গানের মর্মে মর্মে ধ্বনিত হয় পরম ভক্তির সাথে মিলনের সাথে ব্যাকুলতা। এ ধরনের ভক্তিবাদ গান মুর্শিদি ও মারফতি গানের মূল বিষয়। মারফতি ও মুর্শিদি গানের আবেগই মাইজভাণ্ডারী গানের উৎপত্তি। মাইজভাণ্ডারী গানের বাণী শ্রোতার মনে অধ্যাত্ম চেতনার সৃষ্টি করে। মাইজভাণ্ডার তরিকায় 'সেমা' (সংগীতের তালে জিকির) অন্তর্ভুক্ত থাকায় অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্তদের দ্বারা বিপুল সংখ্যক মাইজভাণ্ডারী গান রচিত হয়ে গেছে। সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, রমেশ শীল, বজলুল করিম, আবদুল গফুর হালী, আবদুল লতিফ শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভান্ডারী গান ফার্সী, উর্দু, হিন্দি ও বাংলা লোকসুর সংযোগে গাওয়া হয় এবং তা সুফি সংগীতের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মাইজভাণ্ডারী গান এখন শুধু চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডার গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়। এ গান আজ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের মুখে মুখে; প্রচলিত মাইজভাণ্ডারী গান নিম্নরূপ :

চল মন ত্বরাই যাই
বিলম্বের আর সময় নাই
গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুইল্যাছে।

গাজীরগান

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের মুসলমানেরা গাজী পীরকে মান্য করে। 'গাজীর পট' নামে এক প্রকার পট আছে। পটুয়ারা বাঘের ছবি সম্বলিত গাজীর পট নিয়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গাজী পীরের মাহাত্ম্যমূলক গান গায়। গাজী পীরের গান বা গাজীরগান একজন গায়কের সঙ্গে কয়েকজন দোহার নিয়ে পরিবেশিত হয়। এই গানে ঢোল, খোল, মন্দিরা ইত্যাদি বাজানো হয়। গাজী পীরকে নিয়ে নানা প্রকারের জনশ্রুতি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে।

চটকাগান

চটকাগান বাংলাদেশের সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান। এই গানের রচনা রীতিতে সমাজের প্রতি উপহাস ও ব্যঙ্গাত্মক ভাব রয়েছে। চটকা খুব সরল ছন্দের গান। বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রংপুর জেলাতে চটকা গানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। এই গানের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। সহজ সরল কথা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। চটকা গানের সুর চটুল। এই গানের গতি দ্রুত।

টুসুগান

বীরভূম অঞ্চলের একটি বিশেষ পর্বের নাম 'টুসু'। এই 'টুসু পূজা' উপলক্ষে যে বিশেষ গানগুলো গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় টুসুগান।

ভাদুগান

'ভাদুগান'পূজার গান। ভদ্রেশ্বরী দেবীকে উপলক্ষ করে সারা ভাদ্র মাসে যে গান গাওয়া হয় তাকে ভাদুগান বলে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, কুচবিহার অঞ্চলে এই গানের প্রচলন রয়েছে।

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায়। তবে বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এই গানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। 'ভাব' থেকে ভাওয়াইয়া শব্দটির উৎপত্তি। ভাওয়াইয়া গান দোতারার গান নামেও পরিচিত। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কণ্ঠেও এই গান শোনা যায়। আবার দেখা যায় মহিষের পিঠে চড়ে বেড়ানোর মুহূর্তে তারা গান বাঁধে এবং সুর গেয়ে ওঠে আপন মনে। ভাওয়াইয়া গান বেশির ভাগই আঞ্চলিক কথা ও সুরে রচিত হয়। এ গান এক বিশেষ ঢঙ্গে গলার স্বরকে ভেঙে গাওয়া হয়। ভাওয়াইয়া গানে কয়েকটি প্রকার লক্ষ্য করা যায়। যেমন– মৈষাল বন্ধুর গান, মাহুত বন্ধুর গান, চটকা, ক্ষীরোল, বারোমাইসা, চিতান, গড়ান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালি

পাঁচালির বিষয় হচ্ছে দেব-দেবীর বন্দনা। বাংলাদেশের আদিকালে পাঁচটি পদযুক্ত 'পঞ্চ তালেশ্বর'নামক এক প্রকার গীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে 'পঞ্চ তালেশ্বর'গীতি লোপ পায় ও তা থেকে'পাঁচালি' নামক গীতির উৎপত্তি ঘটে। তবে পাঁচালির নামকরণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 'পাঁচালি' গানের মূল হিসেবে ধরা হয় দাশরথি রায়কে। তিনি পাঁচালিকে রাগসংগীতের সাথে যুক্ত করেন এবং সুর ভঙ্গিতে পাঁচালি পরিবেশনের রীতি প্রচলন করেন। তবে বর্তমানে সহজ সুরে আবৃত্তি করা যায় এমন এক প্রকার গীতিকে পাঁচালি বলা হয়ে থাকে।

গম্ভীরা

গম্ভীরা গানের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিম বঙ্গের মালদহ অঞ্চলে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর মালদহ এলাকা থেকে কিছু মুসলিম পরিবার রাজশাহীর নবাবগঞ্জ এলাকায় বসত গড়ে তোলে। রাজশাহীর জেলা সদর, নাটোর জেলা ও নবাবগঞ্জ এলাকা বাংলাদেশে গম্ভীরা অঞ্চল রূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ট। কিন্তু গান পরিবেশনার সাথে এই অর্থের কোনো মিল পাওয়া যায় না। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু মূলত বর্ষ বিবরণী পর্যালোচনা। সাধারণত বছরের শেষ দিন (চৈত্রমাসে) এই গানের অনুষ্ঠান হয়। আবার নতুন বছরের শুরুতে (বৈশাখ মাসে) এ গান পরিবেশনের রীতি প্রচলিত আছে। এই উপলক্ষে বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলি গানের মাধ্যমে আলোচিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবে শিবের বন্দনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই বন্দনার মধ্যে থাকে লৌকিক জীবন। বর্তমানে সামাজিক অবস্থা সাংসারিক অভাব অনটন;এমন কি রাজনৈতিক হালচালও গম্ভীরা গানে বর্ণিত হতে দেখা যায়। তেমন একটি গানের অংশবিশেষ:

কাম কাজ না করিলে
মান রাহেনা হে ভোলা নানা
দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি
ভোলা নানা নানা হে।

ঝুমুরগান

সাঁওতাল জাতির নাচের নাম ঝুমুর। সাঁওতালদের সঙ্গে বাংলা লোকসংগীতের সংস্কৃতি ও সংযোগ ঘটলে ঝুমুরের ধারা বাংলা লোকসংগীতকে প্রভাব বিস্তার করে। সাঁওতালদের ঝুমুর থেকে বাংলা ঝুমুরের উৎপত্তি হলেও ক্রমে বাংলা ঝুমুরের ধারায় পরিবর্তন আসে। বাংলা ঝুমুরে রাধা-কৃষ্ণের আখ্যান কাহিনি প্রধান বিষয়বস্তু।

ধুয়াগান

পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ধুয়া গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ধুয়াগান একক বা দলবদ্ধ উভয়ভাবেই গাওয়া হয়। কখনো দুই দলে পাল্লা দিয়ে এই গান পরিবেশন করা হয়। বাংলা প্রকৃতিই এদেশের মানুষকে করেছে স্বভাব কবি। এ গানে অনেক সময় সামাজিক অবস্থার দোষত্রুটি তুলে ধরা হয়। ধুয়াগানে দুজন বয়াতি বা গায়েন থাকেন। এদের একজন প্রশ্ন করেন এবং অপরজন উত্তর দেন। অনেক সময় উত্তর দাতা পাল্টা প্রশ্নও করেন।

ধুয়াগান কবি গানের সাথে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। এ গানে ধর্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গীতি কবিরা তাদের গ্রামীণ সরলতা প্রকাশ করে থাকেন। সামাজিক ব্যাভিচার, অন্যায়-অবিচারও তাদের আলোচনায় এসে থাকে। বাঙালির বিভিন্ন লৌকিক উৎসবের গীতিতেও ঝুমুরের প্রভাব পড়ে। যেমন–দাড় শালিয়ার ঝুমুর, খেমটি ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, বারস নাচের ঝুমুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ গীতিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা লোকসংগীতের অন্যতম প্রধান ধারা। ময়মনসিংহ জেলা বাংলার লোকসাহিত্যের তথা লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য আসন জুড়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি গাথাই এক একটি রত্ন বিশেষ। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গাথাগুলোর মধ্যে রয়েছে– মহুয়া, মলুয়া, কবি-চন্দ্রাবতী, রূপবতী ইত্যাদি।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে প্রমুখ সংগ্রাহকগণ উক্ত অঞ্চল থেকে এই মূল্যবান গাথাগুলো সংগ্রহ করেছেন। এই গাথাগুলোতে চারশত ও পাঁচশত বৎসর পূর্বের তখনকার সমাজচিত্র খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। শুধু তাই নয় নিরক্ষর পল্লিকবিদের অপূর্ব কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গাথাগুলো শুধুমাত্র কাব্য প্রতিভারই সাক্ষ্য বহন করে না; এই গাথাগুলোতে অপূর্ব নাট্য উপাদানও লক্ষ করা যায়। গাথাগুলোর আঞ্চলিক সুর বংশপরম্পরায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে অদ্যাবধি গীত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সংগীতগুণীদের জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কোলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় ও এর সদস্যদের দানে বঙ্গসংস্কৃতির বহুমুখী পুষ্টিসাধন ঘটেছে। এই পরিবারের রামলোচন ঠাকুরের সংগীতপ্রীতির কথা জানা যায়। তিনি যে সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও সেকালের খ্যাতিমান পেশাদার গায়ক-বাদকদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমারোহের সঙ্গে সংগীতানুষ্ঠান করতেন সমকালীন বিবরণে তার উল্লেখ মেলে। দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন স্বয়ং সংগীতজ্ঞ, সুকণ্ঠ গায়ক, রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ। তাঁর সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সংগীতজ্ঞান ও চমৎকার গায়নক্ষমতা সম্পর্কে নানা জনের স্মৃতিচারণে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ম্যাকস্ মুলার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগীতজ্ঞান ও গাইবার শক্তি সম্পর্কে যেভাবে জানিয়েছিলেন, তাতে বোঝা যায় যে, রাগসংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীত পদ্ধতিতে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ভালো গান গাইবার মতো মার্জিত কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। সংগীত ও সংস্কৃতিকর্মীদের পৃষ্ঠপোষকরূপেও তিনি উদার ভূমিকা পালন করতেন। পিতার মতো তিনিও সংগীতোৎসবের আয়োজন করতেন। সেকালে প্রকাশিত সংবাদপত্রে তেমন অন্তত দুটি উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়। রামলোচন ঠাকুরের আমলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সংগীত ঐতিহ্যের যে সূত্রপাত ঘটে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে তাঁর বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সে সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা সংগীত চর্চায় ব্রতী হয়ে ওঠেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংগীতোদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এর আমলে। দেবেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে রাগসংগীতের চর্চা করেছিলেন। সে চর্চা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে, তবে ধ্রুপদীয় সংগীতের ধারাটি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতেও তাঁর শিক্ষা ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা ও গম্ভীর। দেবেন্দ্রনাথ সংগীত রচয়িতা ছিলেন। বাংলায় ও সংস্কৃতে তিনি গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা বেশি নয়। তবে তিনিই ঠাকুরবাড়ির প্রথম সংগীত রচয়িতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) -এর প্রভাব ছিল গভীর। সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে, সেই সময়েই সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের বিপরীতে একেশ্বরবাদী অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন করেন। ব্রাহ্ম ধর্মের উপাসনার জন্য প্রচলন করেন ব্রহ্মসংগীতের। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজ সংক্রান্ত ভাবনাই শুধু নয়, তাঁর উপাসনা সংগীতের ভাবনাও দেবেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রামমোহনের পর তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ব্রাহ্ম উপাসনা সংগীতের বা ব্রহ্মসংগীতের বিকাশেও তিনি সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ রাগসংগীত, বিশেষ করে ধ্রুপদরীতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ধ্রুপদী বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সংগীতাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের আমন্ত্রণে। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীও ঠাকুরবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এ বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে সংগীত বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্যতীত স্বনামধন্য ধ্রুপদী যদু ভট্টও সেই বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে কালক্রমে বিভাজন দেখা দেয় এবং বিভিন্ন শাখার উপাসনা সংগীত রীতিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদ সংগীতরীতির প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সমাজ মন্দিরে সংগীতাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিষ্ণু

চক্রবর্তী ধ্রুপদ সংগীত রীতির প্রসারে এবং তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজ গৃহকে রাগসংগীত চর্চার একটি উচ্চমানের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আমন্ত্রিত নন এমন সব সংগীতগুণিও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক সংগীত শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিত্র, মওলা বখশ প্রমুখ ভারতবিখ্যাত সংগীতাচার্য। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর পুত্রকন্যাসহ পরিবারের অনেক সদস্য এই সব গুণীর অধীনে রাগসংগীতে তালিম নিতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ঠাকুরবাড়ির অনেক সদস্যই এই সব উচ্চমানের গুণীর তালিমে তাঁদের সংগীত জীবন গঠন করেন। শুধু বাড়ির ছেলেদের সংগীতাভ্যাস করিয়েই ক্ষান্ত হননি দেবেন্দ্রনাথ; মেয়েদের সংগীত শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি গভীর উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। সেকালে ওস্তাদের অধীনে বাড়ির মেয়েদের তালিম নেওয়া এক অভাবিত ব্যাপার ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

ব্রহ্মসংগীত রচনার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন তা তাঁর পুত্রকন্যা ও পরিবারের সকল সদস্যের জন্য প্রেরণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁরা সবাই ব্রহ্মসংগীত রচয়িতারূপে আবির্ভূত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশানুরাগী ছিলেন। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার গভীর উৎসাহ ছিল। সংগীত দেশপ্রেমের বাণী প্রচারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে ঠাকুরবাড়ির তরুণ সদস্যগণ ব্রহ্মসংগীত রচনার পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গান রচনায়ও মনোনিবেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, ইউরোপের গান এক দিক দিয়ে তাঁর হৃদয়কে খুবই আকর্ষণ করত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হতো যে, 'ইউরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন, ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না।' ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রায় সতের মাস বিলেত বাসের পর ১৮৮০ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় ফেরেন। পাশ্চাত্য সংগীতের একটা রেশ রয়ে গেল মনে। সে সময়কার গান ও গীতিনাট্য রচনায় পাশ্চাত্য সংগীতের যে প্রভাব পড়েছিল তা খুবই লক্ষ্য করার মতো।

পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতার কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে গভীর পরিচয় ছিল তা তাঁর জীবনস্মৃতি থেকে বোঝা যায়। যদিও প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি এই আকর্ষণ দেখে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতরীতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সের সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতরীতির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ ঘটাননি। তবে পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতার রচনাকর্মের অপরিবর্তনীয়তার ধারণা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতীয় সংগীতে গায়কীর যে চিরাচরিত রীতি তাতে গায়ক স্বাধীনভাবে সুরবিহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মূল রচয়িতার রচনা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতের চিরাচরিত পরিবর্তনীয়তার রীতি অপেক্ষা পাশ্চাত্যের অপরিবর্তনীয়তার রীতিটিই গ্রহণ করলেন সাদরে।

১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বাংলাদেশে তাঁদের জমিদারি পরিদর্শনে আসেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে আসেন তিনি। সেখানকার পল্লি প্রকৃতি ও লৌকিক সংগীত, বিশেষ করে বাউল গান তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রাগসংগীতের পরিমণ্ডলে পরিবর্ধিত এবং পাশ্চাত্য সংগীত দ্বারা প্রভাবিত ত্রিশ বছরের তরুণ কবি অনুপ্রেরণার অপর একটি বিশাল জগৎ খুঁজে পান। বাউল সংগীত এবং বাউল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনা পদ্ধতি ও দর্শন চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সংগীত রচনার সূচনা

সঠিকভাবে বলা না গেলেও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, ১৮৭৫ সালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রসংগীতালোচক শুভ গুহঠাকুরতা মনে করেন যে, ১৮৮১ সালকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার প্রারম্ভকাল হিসেবে ধরে নেওয়াই ভালো। তিনি বলেন–"আমরা ১৮৮১ সাল থেকে তাঁর রচনা আরম্ভ হয়েছে ধরে নেব। কেননা, এই সময় থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের একটা ক্রমপর্যায় করা সম্ভব, এর পূর্বেকার রচনা বিক্ষিপ্ত ও সংখ্যাও খুব অল্প।" এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাকাল ৬০ বছর বিস্তৃত।

রবীন্দ্রসংগীত রচনার তিন পর্যায়

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার কাল, তথা রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন শুভ গুহঠাকুরতা। পর্যায়সমূহ হচ্ছে– ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়, ১৯০১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় এবং ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়কে বলা হয়ে থাকে প্রস্তুতির পর্যায়। সে পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের পরিমণ্ডল থেকে প্রেরণা আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। সামনে ছিল ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি সংগীতরীতি নির্মাণের দৃষ্টান্ত। সেসব দৃষ্টান্তকে নিজের রচনায় ব্যবহার করে তিনি পদ্ধতিগত রচনার শিক্ষাকে পাকা করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতের দৃষ্টান্তেও গান রচনা করেছিলেন। ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত কিছু সংগীত অবলম্বনেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেন। সেজন্য সে পর্যায়ে অনেক রচনাকে বলা হয়ে থাকে সংগৃহীত সুর প্রভাবিত গান। বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা এই তিনটি গীতিনাট্য এ পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় পরীক্ষার পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত সুর প্রভাবিত গান অর্থাৎ হিন্দুস্তানি গান ভেঙে গান রচনার ধারা বহুলাংশে ত্যাগ করে রাগসংগীতের ভিত্তিতে মৌলিক সংগীত রচনায় ব্রতী হন। প্রথম পর্যায়ে রাগসংগীতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তা এখানে এসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকসংগীত, বিশেষত বাউল সম্পর্কে তার ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় এই পর্যায়ে।

তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত রচনায় যে বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ তার ভিত্তি স্থাপনা হয় মধ্য পর্যায়ের পরীক্ষামূলক রচনায়। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির রাগসম্মত অথচ কাব্য শ্রীমণ্ডিত গানগুলো পাওয়া যায় এই যুগে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গান এই পর্যায়ে রচিত হয়। দেশাত্মবোধক গানে লোকসংগীতের ব্যাপক ব্যবহার এই যুগের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চ এই ছয়টি নতুন তাল এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। সুররচনা ও ছন্দনির্মাণ এইসব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ তখন এক ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই পর্যায়কে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপূর্ণতার যুগ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তখনকার গানে প্রতিফলিত হয়েছে। সুর ও বাণীর মর্মানুযায়ী সম্মিলন এবং লোকসুর ও রাগসুরের মিলনে এক নব সুর ঢঙ রচনা এ যুগের রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য। বিগত দু-পর্যায়ের প্রচেষ্টা যেন এই যুগে এসে সার্থকতা পেল।

গীতশ্রেণি বিভাজন

রবীন্দ্রনাথের গীতসংকলন গ্রন্থের নাম গীতবিতান। এই গ্রন্থে তিনি নিজে তাঁর রচিত গানসমূহকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগসমূহ হচ্ছে– পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতি। বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক নামে দুটি অপ্রধান বিভাগও রয়েছে। পূজা পর্যায়ের গানসূহকে রবীন্দ্রনাথ ২১টি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। উপবিভাগ সমূহ হচ্ছে–গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধনে, জাগরণ,

নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ ও পরিণয়। প্রেম পর্যায়ের গানে ২টি উপবিভাগ–গান ও প্রেমবৈচিত্র্য। প্রকৃতি পর্যায়ের গানসমূহ ৭টি উপবিভাগে বিভক্তঃ সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। শুভ গুহঠাকুরতা রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাকে ১৭টি ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগগুলো হচ্ছে– ধ্রুপদ ও ধামার, খেয়াল ও ঠুমরি, টপ্পা, ভাঙাগান, লোকসংগীত, নতুন তালের গান, ধর্মসংগীত, প্রেমসংগীত, ঋতুসংগীত, ভানুসিংহের পদাবলি, দেশাত্মবোধক গান, আনুষ্ঠানিক গান, হাস্যরসাত্মক গান, শিশুসংগীত, কাব্যসংগীত, উদ্দীপক গান এবং বেদগান।

পূজা

পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যায় প্রায় সাড়ে ছয়শত। এ পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ সংখ্যক গান রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় তার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা সংগীত হিসেবে ব্রহ্মসংগীতের যে ধারা প্রবর্তন করেন, সে ধারায়ই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্রদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ১৮৮০ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। গানটি হচ্ছে– 'তুমি কি গো পিতা আমাদের'। রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার যে তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার শেষ পর্যায়ের ব্রহ্মসংগীতসমূহে পরিণত রাবীন্দ্রিক সংগীত রচনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি অঙ্গে যেমন ব্রহ্মসংগীত পাওয়া যায়, লোকসংগীতের সুরেও তেমনি এই শ্রেণির গান রচিত হয়েছে।

ভাঙাগান

'ভাঙাগান' বলতে সেইসব গানকে বোঝায় যেগুলো রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন হিন্দুস্তানি সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতির গান, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গান ও পাশ্চাত্যের কতিপয় গানের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সেইসব গানের সুর অবলম্বনে গান রচনা করেছিলেন। দু' একটি গানেমূল গানের বাণী প্রতিধ্বনি ঘটতেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগান রচনার বিপুল উৎস ছিল হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয়সংগীত। ঠাকুরবাড়িতে ভাঙা রচনার একটি ঐতিহ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারাও কম বেশি এই ধরনের গান রচনা করেছেন। তাঁদের গৃহে অধিষ্ঠিত হিন্দুস্তানি সংগীতগুণিদের সঞ্চয় থেকেই মূলগান সংগ্রহ করে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গান সংগ্রহ করেছিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের সংগ্রহও তাঁর কাজে লেগেছিল।

ভাঙাগান রচনার মাধ্যমে তিনি হিন্দুস্তানি রাগসংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে এবং হিন্দুস্তানি সংগীত ঐতিহ্য প্রচলিত শ্রেষ্ঠ গানগুলো সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় লাভে সমর্থ হন এবং রবীন্দ্রনাথকে সুরচয়িতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তবে একটি মূলগান ভেঙে গান রচনা করলেও এর ভেতর দিয়েই কবি তাঁর নিজ সাংগীতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিন্দুস্তানি গান মূলত সুরধর্মী, বাংলাগান কাব্যধর্মী। সুর ও তাল লয়ের কলাকৌশল প্রকাশ হিন্দুস্তানি গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাণীবাহিত ভাবের বিকাশই বাংলাগানের প্রধান বিষয়। বাংলাগানের এই মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনার প্রারম্ভকাল থেকেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনের সুর যোজনায় যে আদর্শ, সেই আদর্শেই তিনি হিন্দুস্তানি গানের সুরকে কাব্যভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। ভাঙাগানের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুস্তানি রাগসংগীতে ব্যাপক অধিকার অর্জন করেছিলেন, অপরদিকে হিন্দুস্তানি সংগীতকলাকে সার্থকভাবে বাংলাগানে ব্যবহার করার শক্তিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীত পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক ভাঙাগান রচনা করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, সেতারের গৎ, বাংলা লোকসংগীত, ভারতের নানা প্রদেশের কিছু গান ও কতিপয় পাশ্চাত্যসংগীত ভেঙে

রবীন্দ্রনাথ বহু সংখ্যক গান রচনা করেছিলেন। ধ্রুপদ ও খেয়াল ঢঙেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক ভাঙা গান রচনা করেন।

রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল

রবীন্দ্রনাথ ৬টি নতুন তাল প্রবর্তন করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে– ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চ। এসব তালে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত গান রচনা করেন সেগুলোই নতুন তালের গান হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত তালসমূহে তালি ও খালি বা তাল ফাঁক প্রথার প্রচলন আছে। রাবীন্দ্রিক তালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে কোনো খালি বা ফাঁক রাখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত তালসমূহ হলো, ঝম্পক ৫ মাত্রা, ষষ্ঠী ৬ মাত্রা, রূপকড়া ৮ মাত্রা, নবতাল ৯ মাত্রা, একাদশী ১১ মাত্রা, নবপঞ্চ ১৮ মাত্রা।

মন্ত্রগান

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রে ও বৌদ্ধ মন্ত্রে সুরারোপ করেছিলেন। এগুলো মন্ত্রগান হিসেবে অভিহিত হয়।

ভানুসিংহের পদাবলি

গীতবিতানে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি নামে একটি গীত বিভাগ রাখা হয়েছে। মোট ২০টি গান এই বিভাগের অন্তর্গত। ভানু, ভানুসিংহ প্রভৃতি ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ এই সব গানে ভণিতা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহের পদাবলি রচিত। এগুলো রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনা। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে এই পর্যায়ের অধিকাংশ পদ রচিত। সংখ্যায় কম হলেও সাংগীতিক মাধুর্যে ও বৈশিষ্ট্যে ভানুসিংহের পদাবলি রবীন্দ্ররচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

দেশাত্মবোধক গান

এক গভীর স্বাদেশিক আবহে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হিন্দুমেলা, 'সঞ্জীবনী সভা' নামে দুটি স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' এবং 'এক সূত্রে বাঁধায়াছি সহস্রটি মন' দেশাত্মবোধক গান দুটি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা হিসেবে উল্লিখিত হয়।

১৮৭৮ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'জাতীয় সংগীত' নামক দেশাত্মবোধক গীতসংকলনে রবীন্দ্রনাথের চারটি গান স্থান পায়। গান চারটি হচ্ছে–'ঢাকোরে মুখ চন্দ্রমা জলদে, 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ', 'অয়ি বিষাদিণী বীণা আয় সখী' এবং 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমানুরাশি'। দেশাত্মবোধের যে আবহে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল তা পরবর্তী জীবনেও তাঁর চেতনায় অটুট ছিল। ১৮৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় কোলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই গানটি গেয়েছিলেন। রামপ্রসাদী সুরে রচিত গানটি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত মিলন গান। এতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য ও মিলন কামনা করা হয়েছে। এ বছরই কবি 'আগে চল আগে চল ভাই' এবং 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ' গান দুটিও রচনা করেন। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কোলকাতা

অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা' গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ন নীরে' গানটি।

তবে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়টি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে (১৯০৫-১৯১১) কেন্দ্র করে। একক ঘটনা হিসেবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রেরণাদায়ক। ১৯০৫ সালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার কথা বলে বঙ্গ বা বাংলাকে ভঙ্গ বা দ্বিখণ্ডিত করার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়া মাত্রই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে খ্যাত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এই আন্দোলনের ফলেই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় দেশাত্মবোধক গান রচনার এক অভূতপূর্ব প্রেরণা দেখা দেয়। একে বলা হয়েছে বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার সুবর্ণ যুগ। এই যুগের নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই আন্দোলনের ভাবাদর্শসমূহ তাঁর গানে অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করেছিল। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো গান রচনা করেছিলেন তাঁর সে সময়কার বিখ্যাত গানগুলো হচ্ছে:

১. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
২. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
৩. ও আমার দেশের মাটি তোমার প'রে ঠেকাই মাথা
৪. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
৫. আমি ভয় করব না ভয় করব না
৬. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
৭. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৮. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৯. নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মন হবেই হবে
১০ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা
১১. যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস্ নে কিছু ইত্যাদি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত হলেও আন্দোলনের সাময়িকতায় গানগুলোর আবেদন নিঃশেষিত হয়নি। দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি এসব গানে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এসব গান বাঙালির চিরকালীন দেশাত্মবোধক গানে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রাম যে রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছিল এবং দেশের মুক্তির জন্য যে অগণিত মানুষ আত্মদান করেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই সব গান তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি। সেজন্যই পাকিস্তানি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই যুগের দেশাত্মবোধক গানে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে লোকসংগীতের সুর ব্যবহার করেন। এর মধ্যে বাউল সুরের ব্যবহারই বেশি। দু'একটি গানে সারি গানের সুর, ব্যবহৃত হয়েছে। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাউল সুরে রচিত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা থেকে প্রায় সরে দাঁড়ান। ১৯১১ সালে রচিত 'জনগণ মন অধিনায়ক' ও ১৯১৭ সালে রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান দুটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ চেতনার আর কোনো গান রচনা করেননি বললেই চলে। ১৯২৯-৩০ সালের পর রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা' 'সর্ব খর্বতারে দহে', 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান', 'চলো যাই চলে যাই', 'খর বায়ু বয় বেগে', প্রভৃতি গান রচনা করেন। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই জাতীয় উদ্দীপনার গান হিসেবে গাওয়া হলেও এই গানগুলি দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশ ভাবনার গান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি। এসব গান বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রচিত।

উদ্দীপনামূলক গান

রবীন্দ্রনাথের কিছু গান উদ্দীপকগান হিসেবে অভিহিত। এসব গানের মূলভাব উদ্দীপনা। উদ্দীপনামূলক গানে বীররসেরই এক প্রকার অভিব্যক্তি ঘটে। দেশাত্মবোধক গানও উদ্দীপনারই গান। 'উদ্দীপক গান' শ্রেণিটিকে চিহ্নিত করেছেন শুভ গুহঠাকুরতা তার 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা' গ্রন্থে। যৌবনের জয়গান করে যেসব গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেগুলো উদ্দীপক গানের পর্যায়ে পড়ে। যেমন:

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
সব কাজে হাত লাগাই মোরা
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি
এবার তো যৌবনের কাছে
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
আমরা নূতন প্রাণের চর
আমাদের ভয় কাহারে

মৃত্যু সম্পর্কে রচিত রবীন্দ্রনাথের কিছু গানকেও উদ্দীপকগান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা, এসব গানের মূলভাগ শোক নয়, শোককে জয় করার শক্তি লাভ। দুঃখ জয়ী এসব রচনা। যেমন:

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
দুঃখ যদি না পাবে তো
মোর মরণে তোমার হবে জয়।

রবীন্দ্রনাথ অন্যায়ের প্রতিবাদে শক্তি সঞ্চয়ের চেতনায় রচনা করেছেন কিছু উদ্দীপকগান। যেমন:

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ।
প্রচণ্ড গর্জনে আনিল একি দুর্দিন
জাগো হে রুদ্র জাগো
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি
তিমিরময় নিবিড় নিশা

কাপুরুষতাকে আঘাত করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন উদ্দীপক গান। যেমন:

ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার

কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি

ভয়েরে মোর আঘাত করো

বিপদের সম্মুখীন হয়ে কবি প্রার্থনা করছেন বিপদজয়ী উদ্দীপনা-

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা

শিশুসংগীত

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশুসংগীত বলে তাঁর কোনো গীতগুচ্ছকে নির্দিষ্ট করেননি। শিশুসংগীত বলতে যে ধরনের রচনাকে বোঝায় তেমন গান রবীন্দ্র রচনায় বেশি নয়। তবে কিছু রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে যেগুলো শিশুদের গাওয়ার উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের শিশুতোষ গদ্য ও পদ্য রচনা যথেষ্ট। সে তুলনায় গান কম। বিভিন্ন নাটকে ঠাকুরদা চরিত্রটি তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে শিশুমন সম্পর্কে তাঁর অপার কৌতুহল ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুভ গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা' গ্রন্থে তেমন কিছু গানের তালিকা দিয়েছেন। সেখান থেকে কয়েকটি জনপ্রিয় শিশুসংগীতের উল্লেখ করা হলো:

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

ফাগুনের নবীন আনন্দে

হাস্যগীতি

বাংলা হাসির গানের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। হাস্যরস অবলম্বনে পূর্বে প্রচুর বাংলাগান রচনা করা হয়েছে। হাসির গানের ব্যবহার নাটকেই হয়েছে বেশি। মঞ্চে পরিবেশকে একটু উপভোগ্য করে তোলার জন্য হাসির গান গাইবার একটা রীতি ছিল। আলাদাভাবেও এ শ্রেণির গান রচিত হতো এবং কিছু গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক এ ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্যঙ্গ ও রঙ্গ উভয়ই হাসির গানের বিষয়। বাংলা হাসির গানের বিকাশে দুটি অনুভবই গুরুত্বপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা হাসির গানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসেবে বিবেচিত হন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যগীতি রচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেননি। তবুও তাঁর রচিত এই ধরনের গান সংখ্যায় ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের হাসির গান মুখ্যত বিভিন্ন নাটকের অন্তর্গত। স্বতন্ত্রভাবে রচিত গান সংখ্যায় খুবই অল্প। ১৯৩৫ সালে 'হৈ হৈ সঙ্ঘ'-এর জন্য রচিত চারটি হাসির গান পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে 'চা-চক্র'-এর জন্য রচিত গানটিও হাস্যগীতি পর্যায়ের। নিম্নে রবীন্দ্ররচিত কয়েকটি হাস্যগীতির উল্লেখ করা হলো। 'হৈ হৈ সঙ্ঘ'-এর জন্য গান চারটি হচ্ছে:

কাঁটা বন বিহারিণী সুরকানা দেবী

পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে

না গান গাওয়ার দলরে মোরা

ও ভাই কানাই কারে জানাই

শান্তিনিকেতনের চা-চক্রের জন্য রচিত গানটি হচ্ছে:

হায় হায় হায়, দিন চলি যায়

বিভিন্ন নাটকে হাসির গান আছে। যেমন 'তাসের দেশ' নাটকে:

জয় জয় তাসবংশ

তোলন নামন পিছন সামন

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র

চিড়েতন হর্তন ইস্কাবন

'ফাল্গুনী' নাটকের গান, যেমন:

আমাদের পাকবেনা চুল গো

আমাদের ভয় কাহারে

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি

ভালো মানুষ নইরে মোরা

আনুষ্ঠানিক সংগীত

নানা ধরনের অনুষ্ঠানের উপযোগী কিছু গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। এগুলো আনুষ্ঠানিক সংগীত নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বাংলা নাগরিক সংগীতের ধারায় এইসব গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনের উপযোগী বহু গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। আশ্রমিক প্রয়োজনের বাইরে সাধারণ অনুষ্ঠানাদির জন্যও কবি অনেক গান রচনা করেছেন। এই সব গান পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, বর্ষশেষ, নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, শিল্পোৎসব, বিদায়জ্ঞাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। এছাড়াও আছে দোলযাত্রার দিনে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে নৃত্যগীত সহযোগে শোভাযাত্রার জন্য রচিত গান– 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল' গানটি, আছে শরৎ ঋতু আবাহনের জন্য পহেলা আশ্বিনে গেয়- 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', বসন্ত ঋতুর বন্দনার জন্য আছে পহেলা ফাল্গুনে গেয়- 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' বা 'আজ দখিন দুয়ার খোলা' ইত্যাদি। নিম্নে কতিপয় আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করা হলো:

বিবাহ অনুষ্ঠানের গান

দুই হৃদয়ের নদী

প্রেমের মিলন দিনে

সুমঙ্গলী বধূ

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

মৃত্যুদিনের গান

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
সমুখে শান্তি পারাবার
ঐ মরণের সাগর পারে

নববর্ষের গান

এসো হে বৈশাখ
ওরে নতুন যুগের ভোরে
জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়

গৃহপ্রবেশের গান

এসো হে গৃহদেবতা
হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে

বৃক্ষরোপণের গান

আয় আমাদের অঙ্গনে
মরু বিজয়ের কেতন উড়াও

হলকর্ষণের গান

আমরা চাষ করি আনন্দে
ফিরে চল্ মাটির টানে

শিল্পোৎসবের গান

নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করছি অনেক। সব ফসলই যে সরাইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকী থাকবে কিছু। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সবকিছুইতো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে, দুঃখে সুখে, আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।" নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো।

প্রকৃতির গান

বাংলা নাগরিক সংগীতের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান। এই শ্রেণির গানকে ঋতুসংগীতও বলা হয়। ষড়ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে লীলাবৈচিত্র্য, তা রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতে যেমনটি রূপায়িত হয়েছে তেমন আর কারও রচনায় পাওয়া যায় না। এ শুধু আকাশে বাতাসে তরুলতায়

ঋতুক্রমে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আসে তার রূপায়ণমাত্র নয়, মানুষের হৃদয়ভাবেও যে পরিবর্তন আসে তাকেও এই শ্রেণির গানে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক অতি গভীর। সকল শ্রেণির গানেই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট মানব হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া স্থান পায়। রাগসংগীত পরিকল্পনায়ও প্রকৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে।

প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতির কোলে লালিত। তখনকার দিনে প্রকৃতির স্পন্দন মানুষের গানে স্বতই ধ্বনিত হয়ে উঠত। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যকে নিয়ে উৎসবের আয়োজন ছিল মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ অঙ্গ। নাগরিক সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লুপ্তপ্রায় সম্পর্কের সূত্রটি পুনরুদ্ধার করে তাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর গানে। ঋতু উৎসবের প্রবর্তন করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রূদ্ধপ্রায় জানালাগুলোকে খুলে দিয়েছেন।

নগরবাসী কবির সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির নিবিড় যোগাযোগ ঘটল ১৮৯১ সালে, ৩০ বছর বয়সে যখন তিনি কুষ্টিয়ায় এলেন জমিদারি তদারকি করতে। কুষ্টিয়া-পাবনা অঞ্চলের প্রকৃতির একরূপ, আবার ৪০ বছর বয়সে যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে গেলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, তখন সেখানে ঘটল প্রকৃতির আরেক রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাংলার প্রকৃতির এই দুই রূপই রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে পরিপুষ্ট করে। তাঁর প্রকৃতির গানে এই দুই রূপই প্রকাশ পায়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এ কথাটির ওপর যে, মানুষের জন্ম কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বে তাঁর জন্ম। মানুষের চিত্তমহলের দ্বার খুলে বিশ্বপ্রকৃতিকে আহ্বান না করলে বিরাটের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন সাধনের বড়ো উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎসব, প্রকৃতির গান। গানের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির বিপুলতাকে, এর সজীব গভীর অস্তিত্বকে যতটা উপলব্ধি করা যায়, আর কিছুতেই তেমন করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভেতর দিয়েই বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যকে আমরা গভীরভাবে অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, ঋতুরঙ্গ প্রভৃতি ঋতু উৎসব এবং তাঁর রচিত অজস্র প্রকৃতির গান আমাদের মধ্যে সেই বোধটিকেই তীব্র করে তোলে যে, মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। ঋতু উৎসবের সূচনা হয় শান্তিনিকেতনে ১৯০৭ সালে। প্রথম বর্ষা উৎসব ও শারদোৎসব পরিবেশিত হয় ১৯০৮ সালে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বর্ষামঙ্গল মঞ্চস্থ হয় ১৯২১ সালে।

বাংলার ঋতুচক্রের সূচনা হয় নববর্ষ থেকে। গ্রীষ্মকাল থেকেই ঋতু পরিক্রমার সূত্রপাত। রবীন্দ্র রচিত গ্রীষ্ম ঋতুর গান পাওয়া যায় ১৬টি। তাপদগ্ধ প্রকৃতির রূপ ফুটে উঠেছে এই সব গানে। এই ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মৌনী তাপস, রুদ্র ভৈরব'। গ্রীষ্ম ঋতু সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে–

দারুণ অগ্নিবাণে রে

নাহি রস নাহি

বৈশাখী হে মৌনী তাপস

বর্ষা ঋতুর ওপর রচিত রবীন্দ্রনাথের গান ১১৫টি। এছাড়াও বর্ষার অনুষঙ্গে অন্যান্য পর্যায়ে রচিত অনেক গান রয়েছে। গ্রীষ্মের দাহে তপ্ত পৃথিবীতে নেমে এলো স্নিগ্ধ, তৃষাহরা, শ্যামলসুন্দর মেঘ। বর্ষা রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় ঋতু। বাঙালি কবি মাত্রেরই প্রিয় ঋতু বর্ষা। নিজের বর্ষার গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– "আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লার জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ষার গান হচ্ছে:

এসো শ্যামল সুন্দর
ঝরঝর বরিষে বারিধারা
মেঘের পরে মেঘ জমেছে
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা
উতল ধারা বাদল ঝরে
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
মন মোর মেঘের সঙ্গী

বর্ষা ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সংসারী, গৃহী। আর শরৎ ঋতুকে তিনি বলেছেন অনাসক্ত, নিঃসম্বল সন্ন্যাসী। নীল আকাশে হাল্কা সাদা মেঘ, তার প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই। কাশের স্তবক না বাগানের না বনের, সে হেলাফেলায় মাঠেঘাটে নিজের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করে বেড়ায়। রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বলেছেন ছুটির ঋতু। এই ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন ৩০টি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শরৎ বিষয়ক রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে:

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

এরপর হেমন্ত। এ ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র ৫টি গান রচনা করেছেন। হেমন্ত সম্পর্কে তিনি তেমন উৎসাহী নন। হেমন্ত রিক্ত, শস্যহীন দিগন্ত তাকে অনুপ্রাণিত করেনি। হেমন্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে:

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হায় হেমন্ত লক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা
হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী

এবার ঋতুচক্রে শীতের পালা। শীত আসে জীর্ণ সাজে। একে রবীন্দ্রনাথ শুষ্কাসন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শীত নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত ১২টি। এখানে শুধুই পত্রহীন, পুষ্পহীন, কাঙাল প্রকৃতির বর্ণনা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শীত বিষয়ক রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে:

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন

এল যে শীতের বেলা
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে

প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চের পরে আবির্ভূত হয় রঙ্গশালার নায়ক ঋতুরাজ বসন্ত। শীতের জীর্ণতাকে, শূন্যতাকে লয় করে দিয়ে পত্রে, পুষ্পে, গন্ধে প্রকৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়ে আসে তারুণ্য ও যৌবনের প্রতীক বসন্ত ঋতু। বসন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু। এই ঋতু নিয়ে রচিত তাঁর গানের সংখ্যা ৯৬। তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের গান দিয়ে ঋতু সংগীত শুরু হয়েছিল, নবযৌবনের ঋতু বসন্তের গান দিয়ে তার সমাপন ঘটল। বসন্ত বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে:

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল
একটুকু ছোঁয়া লাগে
আজি দখিন দুয়ার খোলা
ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া
মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি

ঋতু সংগীত প্রধানত পরিণত বয়সের রচনা– ফলে এইসব গানে পরিণত রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রেম

রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গীতসংখ্যা প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি। প্রেম পর্যায়ের গীত রচনার ধারাটি রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার প্রথম যুগ থেকে শেষ অবধি বিস্তৃত।

নরনারীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গানকেই প্রেম পর্যায়ের গান বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এই সম্পর্কের মাধুর্যময় এবং বেদনাকাতর এই দুটি দিক নিয়েই গান রচনা করেছেন। কখনো কখনো তার অনুভূতির প্রকাশ এমন সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেছে যে, সেখানে ব্যক্তির অনুভূতির চেয়ে সর্বজনের ভাবের বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক স্থানে এমনও হয়েছে যে, পূজার গানে প্রেমের গানে পার্থক্য করা যায় না। প্রিয়জনকে দেওয়ার তাই তিনি দিচ্ছেন দেবতাকে এবং দেবতাকে যা দেওয়ার তাই যেন দিচ্ছেন প্রিয়জনকে। সুরে ও বাণীতে অসামান্য বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রামনিধি গুপ্ত এই পর্যায়ের গীতিরচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে এসে রবীন্দ্রনাথে এই শ্রেণির গানের সর্বোৎকৃষ্ট রূপটি প্রতিফলিত হয়। নিম্নে প্রেম পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

মনে রবে কি না রবে আমারে
আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল
গানের ভেলায় বেলা অবেলায়
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরি করেছ দান

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। সংগীত রচয়িতা হিসেবে জীবন শুরু করার উষাকালেই রবীন্দ্রনাথ তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেন। গীতিনাট্যসমূহ হচ্ছে বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২) ও মায়ার খেলা (১৮৮৮)। কবি তাঁর শেষ জীবনে রচনা করেন তিনটি নৃত্যনাট্য- 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা'। তিনটি নৃত্যনাট্যই কবির প্রথম জীবনে রচিত কাব্যনাট্যের পরিবর্তিত রূপ। চিত্রাঙ্গদা পৌরাণিক উপাখ্যান মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত। চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যের মূল কাহিনি নেয়া হয়েছে বৌদ্ধ উপাখ্যানধর্মী গ্রন্থ 'মহাবস্তু অবদান' থেকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের উপযোগী একটি নৃত্যধারা প্রবর্তন করেছিলেন, এই ধারাটি রবীন্দ্রনৃত্য নামে অভিহিত হয়। ভারতের প্রধান শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা ভরতনাট্যম, কথাকলি, ও মণিপুরী এই তিনটি ধারা থেকেই উপাদান নিয়েছেন তিনি। মণিপুরী নৃত্য সম্পর্কে কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রসংগীতকলার মতো রবীন্দ্রনৃত্যকলাও কবির অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার পরিচয় বহন করে।

সংগীতচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, তিনি বাংলাগানকেই শুধু একটি বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত করেননি, বাংলায় সংগীতালোচনাকেও তিনি একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন। বলতে গেলে, বাংলায় রসগ্রাহী সংগীতালোচনার সূত্রপাত তাঁর হাতেই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে বলেছেন বাংলা গানের সুর ও বাণীর সমন্বয়ের কথা এবং সর্বোপরি তাঁর নিজের সংগীত ভাবনার বৈশিষ্ট্যের কথা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সংগীত কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। প্রবন্ধ অভিভাষণ, পত্রাবলি ও সাক্ষাত আলাপ আলোচনা, সমালোচনা প্রভৃতি মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা প্রকাশিত। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যকার আলাপ আলোচনা। একেবারে তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতালোচনায় হাত দেন। সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। সংগীত বিষয়ে তিনি সর্বশেষ অভিভাষণ দেন ৩০ জুন, ১৯৪০। এই সুদীর্ঘকাল সংগীত সম্পর্কে, বিশেষত বাংলাগান ও নিজের সংগীত রচনা সম্পর্কে লিখতে বা বলতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উৎসাহ বোধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে হিন্দুস্তানি গান ও বাংলাগানের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। হিন্দুস্তানি গান ও বাংলাগানের রীতিপ্রকৃতি এক নয়। হিন্দুস্তানি গান সুরপ্রধান, বাণীর মর্যাদা যেখানে কম আর বাংলাগান বাণীপ্রধান। সুর বাণীর ব্যঞ্জনাকে তীব্র করে তুলতে সাহায্য করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জীবনের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতরচনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি হিন্দুস্তানি সংগীতে গান রচনা করেছেন। কিন্তু হিন্দুস্তানি সংগীতের অলংকার বাহুল্যকে তিনি গ্রহণ করেননি। বাণীর ভাব প্রকাশ করার জন্য সুরের যেটুকু প্রয়োগ প্রয়োজন, তিনি সেটুকুই করেছেন। এই সংযম ও পরিমিতি বোধ থেকে তিনি কখন বিচ্যুত হননি। তিনি সর্বদাই ভেবেছেন সংগীতে বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেয়, মূল বিষয় হচ্ছে আনন্দ। সরল উপায়ে যদি আনন্দ পাওয়া যায় তাহলে জটিল উপায়ের চেয়ে তা অনেক ভালো। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেই বা লিখেই ক্ষান্ত হননি। প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করে একে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনায় অপর প্রধান দিক হচ্ছে যে, তিনি তাঁর রচিত সুরকে পরিবর্তন করানো কোনো অধিকার কাউকে দেননি। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে গায়ক এই অধিকারটি পেয়ে আসছেন। গাইবার সময় তিনি

স্বাধীনভাবে কিছু না কিছু সুরের কাজ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গায়ককে এই অধিকার দিতে সম্মত হননি। এ নিয়ে তর্ক হয়েছে, কথা উঠেছে যে, তিনি আবহমানকালে রীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। তবু সম্মতি মেলেনি তাঁর। তিনি বলেছেন, কবির গীতিরচনা যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি তাঁর সুররচনাও অপরিবর্তনীয়। এটিই রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য। স্বরলিপি অনুসরণ করে সর্বদাই রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা বজায় রাখতে হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বাংলা সনের ১১মে জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ সালের ২৪মে) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী ফকির আহমদ, পিতামহ কাজী আমানুল্লাহ। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন, মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলী। কাজী ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র ও দুই কন্যা। কবির সহোদর তিন ভাই, এক বোন। কবি তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের জন্মের পর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর জন্ম নেন কাজী নজরুল। ছোটো বেলায় কেউ কেউ তাঁকে তারা খ্যাপা বলে ডাকত, আবার আদর করে ডাকত নজর আলী নামে।

কবি পিতৃহীন হন ১৩১৪ সালের (ইংরেজি ১৯০৮ সালে) ৭ চৈত্র। কবি তখন গ্রামের মক্তবের ছাত্র। দারিদ্র্যের সংসারে দেখা দেয় আর্থিক টানাপড়েন, লেখাপড়ার ক্ষতি হতে থাকে কবির। ১৩১৬ সালে ১০ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর এক বছর এই মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। সে সময় আশেপাশে গ্রামগুলোতে মোল্লার কাজ করেও রোজগারের চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইমাম এর দায়িত্ব পালন করতেন।

আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রথম পাঠ ছিল মক্তবের শিক্ষক মৌলভী কাজী ফজলে আহমদের কাছে। তাঁর এক পিতৃব্য কাজী বজলে করীম ফারসি ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। এর সাহচর্যে কবির আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত বাংলায় কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। আরবি-ফারসি শিক্ষা, ইমামতি, গোরখেদমতগারি, কুরআন খোৎবা পাঠ, কবির ধর্মীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্যে ও বাংলাগানে ইসলামী তাহজিব ও তমদ্দুনের যে নতুন ধারার প্রবর্তন তিনি করলেন তার উৎস ছিল কৈশোরের এই দিনগুলো। তাঁর কাব্য ও গীতিতে, বিশেষ করে গজল গানে, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের যে সচ্ছন্দ প্রয়োগ, যে অনায়াস স্ফূর্তি, তার বীজও ছিল এই সময়টিতে রোপিত।

কবি বারো বছর বয়সে বাসুদেবের লেটোগানের দলে যোগ দেন। এই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি হিন্দু সংস্কৃতি ও পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। লেটো দলের জন্য শকুনি-বধ, মেঘনাদ-বধ, রাজপুত্র, চাষার সং, দাতাকর্ণ পালাগান প্রহসনে কবির চিত্তে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থানের একটি উদার পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে দেখা যায়, যার ফসল পাওয়া যায় তাঁর ভবিষ্যত কাব্য জগতে।

লেটো দলে যোগদান কবিচিত্তকে নানা ভাবরসে সিক্ত করেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি যে ফরমায়েশ মতো দু'হাতে অজস্র গান লিখেছেন ফুলঝুরির মতো, তারও হাতেখড়ি এই লেটোদলের পরিবেশে। এই সময়ের অপরিণত বয়সের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে দেহতত্ত্ব ও মুর্শিদ-ভাবের উপস্থিতি। কিন্তু নজরুলের প্রকৃতি ছিল সদা চঞ্চল, কোথাও দুইদণ্ড স্থির থাকবেন এমন মানসিকতা তাঁর ছিল না। কৈশোর, যৌবনে কোনো জায়গায় তাঁকে

কেউ দীর্ঘদিন অবস্থান করতে দেখেনি। এই অসামান্য প্রতিভার লালন হয়েছে নেহায়েতই কাকতালীয়ভাবে। যথেষ্ট অবকাশ নিয়ে অনুশীলনে, শৃঙ্খলায় তার প্রতিভার লালন হয়নি। লেটো দলে তিনি যোগদান করেন সাধারণভাবে। অথচ নিজ প্রতিভায় হলেন এঁদের ওস্তাদ। আবার আকর্ষণ শেষ হলেই তিনি দলত্যাগ করে চলে গেলেন, হলেন মাথরুন গ্রামের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সেখানে শিক্ষক হিসেবে পেলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে। বয়স তখন এগারো, সালটি ১৯১১। অল্প সময়ের মধ্যেই মাথরুন স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলো, শুধুমাত্র অর্থাভাবে। রাণিগঞ্জে রেলওয়ের এক গার্ড সাহেবের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন বাবুর্চীগিরি করলেন। আবার বাসুদেবের শখের কবিগানের আসরে ঢোলক বাজিয়ে গান গাইতে দেখা যায় নজরুলকে। নজরুলের জীবনে ছিল নানান উত্থান পতন, কিন্তু সংগীতচর্চার ধারাবাহিকতায় তার ছেদ পড়েনি কখনো। আসানসোলে একটি চা-রুটির দোকানে কাজ পেলেন, মাইনে মাসিক এক টাকা। কিন্তু থাকার জায়গা নেই। পাশেই একটি তিন তলা বাড়ির নিচের সিঁড়ির ঘরে সারাদিনের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত নজরুল-এর থাকার জায়গা হলো। এক পুলিশ ইন্সপেক্টর, নাম কাজী রফিজউল্লাহ, থাকতেন এ বাড়িতে। কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শামছুন্নেসা কবিকে স্নেহ করতেন। তাঁদের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলা গ্রামে। তাঁদের প্রচেষ্টায় কবি ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণিতে, ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে। ১৯১৪ সালে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন। এরপরে তিনি ভর্তি হন রাণিগঞ্জ শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ এই তিন বছর স্থিত থাকেন এই স্কুলেই, যেখানে তাঁর বন্ধু হয়ে আসেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাত টাকা মাসিক বৃত্তিও পান কবি। ফারসি ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় এই স্কুলের ফারসি ভাষার শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সাহচর্যে। স্কুলের অপর শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালও তাকে সংগীতে করেন দীক্ষিত। শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রাথমিক পাঠ তাঁর কাছেই হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে নজরুল ছিলেন দশম শ্রেণিতে। প্রি-টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে। নজরুল দেখলেন শহরের দেয়ালে আঁটা পোস্টারে বাঙালি যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহবান। সেনাবাহিনীর উত্তাল জীবন তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলো। পরীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সেনাদলে নাম লেখালেন তিনি। চলে গেলেন লাহোর হয়ে নওশেরওয়াতে। এখানে তিন মাসের ট্রেনিং শেষে তাঁকে যেতে হয় ৪৯নং বাঙালি পল্টনের হেড কোয়ার্টার করাচি।

অল্পদিনের মধ্যে তিনি ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। নজরুলের সৈনিক জীবন আড়াই বছরের। কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যেও তার সাহিত্যচর্চা ছিল নিরলস। তাঁর প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি' এবং প্রথম কবিতা 'মুক্তি' এই সময়েরই লেখা। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি' প্রকাশিত হয় মাসিক সওগাতের প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সালে) এবং 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসের ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্যে'। সওগাতে এর পরপরই আশ্বিন সংখ্যায় কবিতা-'সমাধি' ভাদ্র সংখ্যায় 'স্বামীহারা' এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে' পত্রিকা'র কার্তিক ও মাঘ (১৩২৬ সালে) সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয় 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' গল্প দুটি। এই সময় গল্প লেখক হিসেবেই নজরুলের প্রকাশ ঘটে। এই সময়েই 'রিক্তের বেদন' ও 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসের বেশকিছু অংশ লেখা হয়। বাঙালি পল্টনের পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেবের কাছে দিওয়ান-ই-হাফিজ, মহানবী, রুমি প্রভৃতি বিখ্যাত ফারসি কাব্য পাঠ করে তিনি মহৎ সাহিত্য ও মহৎ জীবনের সন্ধান পান। সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রেমিক কবি রুমির গজল ও দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে মূল ছন্দের অনুসরণে ছয়টি গজল বাংলায় অনুবাদ করেন। পরিণত বয়সে তাঁর লেখা 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াত-এ ওমর খৈয়াম' বাংলা কাব্যানুবাদ, তাঁর সৈনিক জীবনের পড়াশোনার সুফল।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হয়। তার প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় সম্ভবত 'বাঁধনহারা' প্রথম পত্রোপন্যাস। বাঁধনহারার মূলে ছিল ব্যর্থ প্রেম। যার পরিণতি বিদ্রোহ। এই পত্রোপন্যাসে 'সাহসিক এক সুদীর্ঘ চিঠিতে বিদ্রোহের বাণী উপস্থিত, যা তাঁর বিদ্রোহী কবিতারই পূর্বাভাস, বা পূর্বলেখ। ইতোমধ্যে সান্ধ্য দৈনিক নবযুগে যোগ দিলেন কবি। নবযুগের প্রথম প্রকাশ ছিল ১৯২০ সালের ১২ জুলাই : স্বত্বাধিকারী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। যুগ্ম সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমদ। নবযুগে নজরুল যে প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন তার কিছু সংকলিত হয় 'যুগবাণী প্রবাহ' পুস্তকটিতে, যা ছাপা হয় ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে। নবযুগের কাজ ছেড়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে নজরুল ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে দেওঘরে যান। যাওয়ার আগে লেখেন 'বন্ধু আমার। থেকে থেকে কোন সুদূরের নির্জন-দূরে, ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?' তাঁর কণ্ঠে গানটি শুনে মোহিতলাল মজুমদারের মতো সমালোচকও আনন্দিত হয়ে ওঠেন। গল্প-কবিতা-উপন্যাস রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবির সংগীত চর্চাও চলতে থাকে পুরোদমে। তিনি গানও গাইতেন সুন্দর কণ্ঠে, তাঁর গলার প্রশংসাও কোলকাতার সংগীত মহলে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বন্ধুদের অনুরোধে গাইতেন 'পিয়া বিনা মোরা হিয়া না মানে, বদরী ছাইরে' একটি হিন্দুস্তানি গান।

দেওঘর থেকে ফিরে কবি সাহিত্য সমিতির অফিসে আফজাল-উল-হকের সঙ্গে থাকেন। এখানে কুমিল্লার আলী আকবর খানের সঙ্গে হয় তার পরিচয়, তারই অনুরোধে তিনি দৌলতপারে এসে হাজির হন ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে। কুমিল্লায় আসার পথে ট্রেনে বসে কবি রচনা করেন 'নীলপরী' কবিতাটি। দৌলতপুরে আলী আকবর খানের এক ভাগ্নী নার্গিস আরা খানমের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় (বাংলা ১৩২৮ সনের ৩ আষাঢ়) ১৯২১ সালের ১৭ জুন শুক্রবারে। কিন্তু এ বিয়ে টেকেনি। বিয়ের দিন রাতেই কবি দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে চলে আসেন বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারের অতিথি হিসেবে। দৌলতপুরে থাকার সময় লেখা হয় 'অ-বেলায়', 'অনাদৃত', 'বিদায় বেলায়', 'হারমানা-হার', 'হারামনি', 'বেদনা', 'অভিমান' 'বিধুরা', 'পথিক প্রিয়া' ইত্যাদি কবিতা। কুমিল্লায় সেবার কবি ছিলেন মোট ২১ দিন। রচনা করেন 'পরশ-পূজা', বিজয় গান, 'পাগল পথিক', 'মনের মানুষ', 'বন্দী-বন্দনা', 'মরণ-বরণ' ইত্যাদি কবিতা ও গান।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবির বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা। ছাপা হওয়ার পরই কবিতাটি তুমুলভাবে আলোড়ন জাগায় সারা বাংলায়। বাইশ বছরের এক তরুণ কবি লিখেছেন এমন একটি কবিতা, যার প্রতি ছত্রে রয়েছে বিদ্রোহের বহ্নিশিখার প্রজ্বলন। একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা বোধ হয় আর কোনো দ্বিতীয় কবিতাকে নিয়ে হয়নি বাংলা সাহিত্যে।

১৯২১ সালের নভেম্বরে কবি আবার কুমিল্লায় আসেন। এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারত আগমন উপলক্ষে সারা দেশে হাঙ্গামা হয়, পালিত হয় হরতাল। হরতাল উপলক্ষে নজরুল লেখেন একটি বিখ্যাত জাগরণী গান এবং মিছিলের পুরোভাগে এই গানটি গেয়ে কবি সারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে নজরুল আবার কুমিল্লায় গিয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় প্রমিলা সেনগুপ্তর সঙ্গে তার গভীর প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৩২৯ বাংলা সনের ২৫ শ্রাবণ 'ধূমকেতু' প্রকাশ লাভ করে। ধূমকেতু আদি সাপ্তাহিক, প্রতি সংখ্যা এক আনা, পত্রিকার সারথি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রিন্টার পাবলিশার আফজাল উল-হক। ধূমকেতুতে বের হতে থাকে নজরুলের জ্বালাময়ী সব প্রবন্ধ। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' বের হওয়ার পর পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লাতে আত্মগোপন করার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচারে কবির এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ধূমকেতু প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছিল বাংলার নির্যাতিত দলের অগ্নিবাণীর বাহন। সম্পাদকীয়গুলো বাছাই করে 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী', নামে দুইটি গ্রন্থ বের হয়। বাংলা ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী' 'সাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' প্রভৃতি কবিতা এতে ছিল। প্রথম সংকলন অল্পদিনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় আর কোনো কাব্য বাজারে এত সমাদৃত হয়নি।

কিছুকাল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখার পর নজরুলকে হুগলী জেলে বদলী করা হয়। সেখানে কবি লেখেন শিকল পরার গান, বন্দনা প্রভৃতি গান। জেলের ব্যবস্থার প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। হুগলী জেলেই নজরুল লেখেন 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতাটি। তিনি জেলে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন (১০ ফাল্গুন ১৩২১)। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুল কারামুক্ত হলে সোজা চলে যান কুমিল্লায়। পরে ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুল পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতার ৬ নং হাজি লেনের বাড়ির একটি কক্ষে। 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের লেখিকা মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এই বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। নজরুল তাঁর 'বিষের বাঁশি' উৎসর্গ করেছিলেন মিসেস এম রহমানের নামে। বিয়ের পর কবি সপরিবারে হুগলীতে চলে যান। এই সময়টি ছিল কবির বিশেষ আর্থিক দুরবস্থার দিন, তবুও লেখা থেমে থাকেনি। তার 'মুক্তিকাম', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', সব্যসাচী, ঝড়, ফালগুনী, 'চরকার গান', 'কৃষাণের গান' এই সময়ের রচনা।

হুগলীর বাড়িতে থাকাকালীন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মৃত্যু বরণ করেন। নজরুল শ্রদ্ধার্থ জানান 'অর্ঘ্য' নামে একটি গানে যা দেশবন্ধুর শবাধারে মালার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আরও লেখেন 'অকাল-সন্ধ্যা' 'সানা' 'ইন্দ্র পতন' কবিতা এবং 'রাজভিখারী' নামে একটি গান। রচনাগুলো একত্রে প্রকাশিত হয় 'চিত্তনামা' নামে কাব্যগ্রন্থে। এই সময় বাঁকুড়ার দলমাদল কামানের গায়ে হেলান দিয়ে ভোলা নজরুলের বিখ্যাত ছবিটি 'চিত্তনামা' গ্রন্থে স্থান পায়। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র "লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। সম্পাদক শ্রী মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এ প্রকাশিত হয় 'সাম্যবাদী' 'কৃষাণের গান' 'সব্যসাচী'। এই কবিতাগুলো সাম্যবাদী পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি হুগলী ছেড়ে কবি আসেন কৃষ্ণনগরে। এখানে লেখেন শ্রমিকের গান, কোরাস সংগীত: 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। 'ছাত্রদলের গান' তাঁর এই সময়ের রচনা।

১৯২৬ সালের জুন মাসে নজরুল একবার ঢাকায় আসেন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশন (২৭ জুন রবিবার) কবি কয়েকটি গান গেয়ে তরুণদের মাঝে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। আর্থিক

দিক দিয়ে নিঃস্ব কবি এই সময় কেন্দ্রীয় আইন সভার পদপ্রার্থী হয়ে ব্যযবহুল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। জুলাইতে যান চট্টগ্রামে। রচনা করেন, 'অনামিকা' ও 'গোপন প্রিয়া'। তাঁর 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ লেখাই এই সময়ের। লাঙল এর পনেরটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এ পত্রিকায় নজরুলের 'মন্দির ও মসজিদ' 'হিন্দু-মুসলমান', নামে দুটি প্রবন্ধ ও 'জাগো অনশন বন্দি ওঠোরে যত' 'অন্তর-ন্যাশনাল সংগীত' 'রক্ত পতাকার গান' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল ভূমিষ্ট হয়। পুত্রের নাম অনুযায়ী তাঁর সংগীত গ্রন্থের নাম রাখেন বুলবুল। এই সময় ১৯২৬ সাল থেকেই নজরুল গজল গান লেখার দিকে আকৃষ্ট হন। মিসরীয় নর্তকী ফরিদার নৃত্য সহযোগে গজল 'কিসকি খায়রো ম্যায় করবো যে দিন হিলা দিয়া' সুরে ১৩৩৩ সনের ২৮ অগ্রহায়ণে রচনা করেন 'আসে বসন্ত ফুলবনে সাজে বনভূমি সুন্দরী' গানটি। এই সময় থেকেই নজরুলের গানে স্বকীয়তা ফুটে ওঠে।

কৃষ্ণনগরেও কবির আর্থিক অনটন অব্যাহত থাকে। এই পটভূমিকায় কবি লেখেন তার সুবিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতাটি, পরে তা কল্লোল' ও 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্বোধন উপলক্ষে কবি কৃষ্ণনগর থেকে ঢাকায় আসেন। আসার পথে স্টিমারে বসে রচনা করেন উদ্বোধনী গান, 'আসিলে কে গো অতিথি উড়িয়ে নিশান সোনালি', এবং 'বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কেগো উদাসিনী' গান দুইটি। আবার ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় এলে লেখেন সেই বিখ্যাত মার্চ সংগীতটি 'চল চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'।

১৯২৪ সালে আফজাল-উল-হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নওরোজ' নামে মাসিক পত্রিকাটি। নওরোজে নজরুলের 'ঝিলিমিলি', 'সারাব্রীজ' ও 'কুহেলিকা' উপন্যাসের অংশ প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালের প্রথম দিকে তিনি চলে আসেন আবার কোলকাতায়, 'সওগাত' অফিসের দুইটি ছোটো ঘরে আশ্রয় নেন তিনি। কবির সংকলন 'সঞ্চিতা' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

সমর্থন ও বিরোধিতা দুইটিই নজরুলের ভাগ্যে ছিল। 'শনিবারের চিঠি', 'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্শন', 'মোহাম্মদী' একদিকে, অন্যদিকে 'সওগাত' ও তার সঙ্গী গুণিজন নজরুলের পক্ষে। তবে নজরুলের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয় যেখানে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নজরুল সবার অনুরোধে গেয়ে শোনান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ও 'বীরদল চলে সমরে' গান দুটি।

১৯৩০ এর অগাস্ট মাসে নজরুলের 'প্রলয় শিখা' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে আবার ইংরেজ শক্তির হামলার শিকার হন তিনি। বিচারে ছয় মাসের জেল হয়। তারপর ১৯৩১ সালের ৩০ মার্চ তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

নজরুল একবার মুজাফফর আহমদের জন্মস্থান সন্দ্বীপ যান। সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপটির সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে নজরুল রচনা করেন 'মধুমালা' ও 'চক্রবাক এর' কবিতাগুলো আর ভাটিয়ালি আশ্রিত 'সাম্পানের গান'। এর আগে নজরুলের মা ইন্তেকাল করেন (১৯২৮) এবং নজরুলের প্রথম ছেলে আজাদ কামালেরও অকাল মৃত্যু হয় হুগলীতে। দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল মারা যায় বসন্ত রোগে ১৯৩০ সালে কোলকাতায়।

নজরুলের মানসিক জগতে আসে বিরাট পরিবর্তন। আধ্যাত্মিকতায় মনোনিবেশ করেন তিনি। এর মধ্যেই মূল ফারসি থেকে 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অনুবাদ করেন। রোগশয্যায় শায়িত বুলবুলের শিয়রে বসেই এই অনুবাদের শুরু করেছিলেন তিনি। ১৯২৯ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ঘটে। ১৯৩৫ সালে কবি গ্রামোফোন কোম্পানির একমাত্র গীতিকার-সুরকার পদটি পান। ১৯৩১এর দিকে কবি সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর 'আলেয়া' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। 'ধ্রুব'(চলচ্চিত্র) মুক্তি পায় ১৯৩৫ সালের ১ জানুয়ারি। এই ছবির সংগীত রচনা ও পরিচালনা ছাড়াও তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর লেখা 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৮ সালে ২ এপ্রিল) এবং 'সাপুড়ে' (১৯৩৯ সালের ২৭ মে) ছায়াছবিতে রূপ লাভ করে।

১৯৪০ সালে নজরুল কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। 'হারামণি' এবং 'নবরাগ' মালিকা অনুষ্ঠান দুইটি জনপ্রিয় হয়। অসংখ্য লুপ্তপ্রায় রাগের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত হারামণি অনুষ্ঠান। 'কাফেলা', 'কাবেরী তীরে' প্রভৃতি গীতি-নাটিকা বেতারের জন্যেই লিখিত হয়েছিল। নজরুলের গান ও সুরের ছোঁয়ায় অল ইন্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

নবপর্যায়ে দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হলো ১৯৪০ সালের অক্টোবরে। নজরুল হলেন প্রধান সম্পাদক। এ সময় 'নবযুগ' ও 'সঙ্গীত'-এ প্রকাশিত কবিতার সংকলিত রূপ নতুন চাঁদ ও শেষ সওগাত।

কিছুকাল ধরেই কবির জীবনে অশান্তির পর অশান্তি নেমে আসছিল। স্ত্রী প্রমিলা নজরুল ১৯৪০ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। আর্থিক অনটন চরম পর্যায়ে এলো চারদিকে অর্থাভাব, অনটন। সেদিন কেউই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

সুরের বুলবুল, সারা জীবনে দুঃখের নদীতে সন্তরণরত দুখু মিঞা ১৯৪২ সালের ১ জুলাই একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোনো চিকিৎসা হলো না। সুদীর্ঘ দশ বছর পর কয়েকজন গুণিমানুষের চেষ্টায় 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হলো। সম্পাদক কাজী আব্দুল ওদুদ। এঁরা সস্ত্রীক কবিকে রাচী সেন্ট্রাল হসপিটালে পাঠান। দীর্ঘ চার মাস চিকিৎসার পরও কোনো রোগ পাওয়া যায়নি। শেষে কবি সস্ত্রীক ১৯৫৩ সালের ১০ মে কোলকাতা থেকে রওনা হয়ে ৮ জুন লন্ডনে পৌছান। এখানে সারগাট, টি এ বেটন ম্যাকসিক এবং র‍্যাসেল ব্রেন কবিকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোগ নির্ণয়ে তারা একমত হতে পারলেন না। এরপর কবিকে ৭ ডিসেম্বর ভিয়েনায় পাঠানো হয়। বিশ্ববিখ্যাত স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ড. হ্যাল কফ কবিকে পরীক্ষা করেন। ১৫ ডিসেম্বর কবিকে কোলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তার জন্য তখন পাগল। সবার প্রিয় কবি আর সুস্থ হলেন না।

১৯৪৫ সালে কবিকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার দেওয়া হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি দেন ১৯৬০ সালে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করেন ১৯৬৯ সালে। সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর কবিপত্নী প্রমীলা ১৯৬২ সালের ৩০ জুন লোকান্তরিত হন।

কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। কাজী সব্যসাচী ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আবৃত্তিকার আর কাজী অনিরুদ্ধ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীটার বাদক। কাজী অনিরুদ্ধ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মারা যান। কাজী সব্যসাচী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ মারা যান। সব্যসাচীর দুই কন্যা খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী ও এক পুত্র বাবুল কাজী। অনিরুদ্ধের বিধবা পত্নী কল্যাণী কাজী ও দুই পুত্র কাজী অনির্বাণ ও কাজী অরিন্দম ও এক কন্যা অনিন্দিতা বর্তমান।

১৯৭২ সালে ২৪ মে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে তাঁর ঢাকা আগমন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় কবিকে বরণ করে নেওয়া হয়। কবিকে দেওয়া হয় রাজকীয় সম্মান। কবির জন্য সম্পূর্ণ দোতলা একটি বাড়ি, একটি গাড়ি, নার্স, ডাক্তার দিয়ে সব রকম সেবা শুশ্রুষার ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হয়। কবির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় ছিয়াত্তর সালের জানুয়ারি মাসে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি দেন ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর। ১৯৭৬ সালে কবিকে দেওয়া হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। তাঁকে পিজি হাসপাতালে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশের সকল মানুষ তার মৃত্যুতে শোকাবিহ্বল হয়ে পড়ে। ২১ আগস্ট তার জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শরিক হন। পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঐ দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই' গানে কবি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।

লালন সাঁই (১৭৭৮ - ১৮৯০)

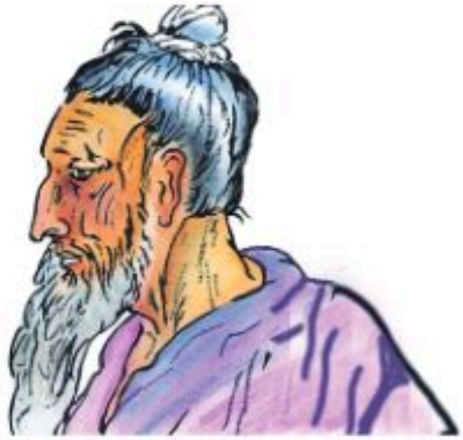

চিত্র: লালন সাঁই

বাংলা লোকসাহিত্যের তথা এই উপমহাদেশের অন্যতম দিকপাল বাউল সাধক ফকির লালনসাঁই। তিনি ১১৭৯ সালের (বাংলা) ১ কার্তিক ১৭৭৪ সালের ১৪ অক্টোবর বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দরীবুল্লাহ দেওয়ান এবং মাতার নাম আমিনা খাতুন। তিনি ১১৮ বৎসর

বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১২৯৭ সালের ১ কার্তিক শুক্রবার (বাংলা) এবং ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (খ্রি.) এই দার্শনিক কবি দেহত্যাগ করেন। এই সমস্ত তথ্য লালনের প্রিয় শিষ্য দুদুশাহ্ লিখিত একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথি থেকে (রচনা ১৩০৬ সাল ১৮৯৬ খ্রি:) পাওয়া যায়।

লালন সাঁইয়ের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে লালনের শিষ্য দুদ্দু শাহের লেখা থেকে জানা যায় যে, অতি শৈশবে লালনের পিতা-মাতা পরলোকগমন করেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। যথাক্রমে আলম, কলম ও লালন। লালন ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সাধক লালনের জন্মের মাত্র দুই বছর পূর্বে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। পিতৃ-মাতৃহীন লালন তখন আত্মীয়-স্বজন দ্বারা লালিত-পালিত হন। আবার জনাব আফসারউদ্দীন শেখ সাহেব বলেছেন, কিশোর লালন এক সময় হরিশপুরে দক্ষিণ পাড়ার ইনু কাজীর বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং গো রাখালের কাজে নিযুক্ত হন। তবে একথা কতটুকু সত্য তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার লালন শিষ্য দুদু শাহ্ বলেছেন, লালন সাঁইয়ের বাল্যকাল এবং তরুণ জীবন অতিবাহিত হয় লালন গুরু সিরাজ শাহের আশ্রয়ে।

বাল্যকাল থেকেই লালন গীত-বাদ্য পছন্দ করতেন। ঐ সময় হরিশপুর অঞ্চলে ধুয়া-জারিগানের বিশেষ প্রচলন ছিল। লালন সাঁই এই গানের প্রতি এতই তিনি অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি সংসারের কাজকর্ম উপেক্ষা করে গান গেয়ে বেড়াতেন। এজন্য লালনকে বড়ো ভাইদের ভর্ৎসনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। কিন্তু কোনো বাধাই কিশোর লালনকে পরাভূত করতে পারেনি। তখন থেকেই লালন সাঁইয়ের গায়ক হিসেবেপরিচিতি লাভ করতে থাকেন।

বাউল কবি লালন সাঁইয়ের লেখা-পড়া সম্পর্কে শিষ্য দুর্দু শাহ্ তেমন কোনো তথ্য দেননি। বেশকিছু সংখ্যক ফকিরের মতে তিনি নিরক্ষর ছিলেন। এ বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন "হিতকারী পত্রিকাতেও ঐ রূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, সাধক লালন তাঁর গানের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের যে জ্ঞান, মতবাদের ওপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সভ্য দৃষ্টি ও কবি শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিলে লালনকে নিরক্ষর ভাবিতে কুণ্ঠাবোধ হয়। তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন এই মতের পক্ষে তেমন গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। লালন পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণকেই শ্রেয় মনে করতেন। তাই তিনি বলেছেন,

এলমে লা দুন্নি হয় যার
সর্বভেদে মালুম হয় তার।

উল্লিখিত পংক্তিসমূহে শাস্ত্রাদি আলোচনা ও মীমাংসার কথা আছে। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় শাস্ত্র বিশ্লেষণ করা মোটেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষা ভালোভাবে পড়তে, লিখতে ও বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন শাস্ত্রের তুলনা, গ্রহণযোগ্য তথ্য এবং সেই বিষয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। মরমী কবি লালনসাঁই যে শিক্ষিত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত পংক্তিগুলোতে বিদ্যমান।

সাধক কবি লালনসাঁই কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ বিষয়ে তার জীবৎকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। এই মতভেদ বর্তমানেও বিদ্যমান। প্রচলিত বিশ্বাস মতে লালন জন্মগতভাবে কায়স্থ সন্তান। তার মায়ের নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভমদাস। সাধক লালনের জীবনীকার বসন্ত কুমার পাল মনে করেন ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয় এবং লালনের আসল নাম লালন চন্দ্র দাস। তিনি ভাঁড়ারার ভৌমিকদের জ্ঞাতি ছিলেন।

যৌবনের প্রাক্কালে সাধক লালনসাঁই কাশী বা পুরীর তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে ছেঁউড়ে নামক গ্রামের কাছে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে ফুলবাড়ী নিবাসী সিরাজশাহ্ নামে

এক মুসলমান ফকির মুমূর্ষু অবস্থায় লালনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। তার এবং তার স্ত্রীর সেবা যত্নে লালন আরোগ্য লাভ করেন। লালন আরোগ্য লাভ করলেও তার একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। এরপর তিনি এই মুসলমান ফকিরের নিকট ইসলাম ধর্ম মতান্তরে বাউল বা ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত হন।

অপরপক্ষে লালনশিষ্য দুদু শাহ বলেছেন যে, (১২২২ সালে) লালন সাঁই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে খেতুরীর মেলায় যোগদান করেন। মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে লালন সাঁই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ধারণা করা যায় বসন্তের পূর্বলক্ষণসমূহ খেতুরী অবস্থানকালে প্রকাশ পায়। লালন সাঁইয়েরপক্ষে পদব্রজে গমন করা অসম্ভব মনে হওয়ায়, তিনি ভাড়াটিয়া নৌকাযোগে গড়াই নদী দিয়ে কুষ্টিয়া ভাঁড়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে লালন সাঁই ব্যাধির প্রকোপে জীবনমৃত অবস্থায় উপনীত হন। নৌকার মাঝি তাকে মৃত মনে করে এবং গায়ে বসন্তের চিহ্ন দেখে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী কালিগঙ্গার মোহনায় ফেলে যায়। কালিগঙ্গা তীরস্থ এই স্থানটি ছেঁউড়িয়া। এই ছেঁউড়িয়া গ্রামের মলম বিশ্বাসের ঘাটে লালন সাঁই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন। লালনের দেহে জীবনের লক্ষণ অবশিষ্ট থাকায় মলম বিশ্বাস দয়া পরবশ হয়ে লালনকে তার আপন গৃহে নিয়ে যান, স্বামী-স্ত্রী মিলে তাঁর সেবা যত্ন করেন। ক্রমে ক্রমে লালনের পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মলম বিশ্বাস ও তার স্ত্রী লালন শাহের নিকট 'বাইয়াৎ' গ্রহণ করেন। এভাবেই লালন সাঁই ছেঁউড়িয়া উপস্থিত হন। বর্তমানে লালন সাঁইয়ের মাজার ও দরগাহ কুষ্টিয়া শহরের অদূরে 'ছেঁউড়ে' নামক স্থানে বিদ্যমান।

লালন জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন লালন গুরু সিরাজ শাহের স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হন। এই গুরুর সাহচর্যে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়। এইসময় লালন-গুরু সিরাজ শাহের নিকট বাউল তত্ত্বে পুরোপুরিভাবে দীক্ষিত হন।

উল্লেখযোগ্য যে, বাউল মতবাদ উপমহাদেশের বিশেষত পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সংখ্যাযোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে বিকশিত। বাউল মতের রূপান্তর সাধনে লালন সাঁইয়ের দার্শনিক ভিত্তি অত্যন্ত প্রগতিশীল ও মূল্যবান। বিশ্বমানবতার প্রবক্তা লালন সাঁই মানব জাতির জন্য কোনো বিভাগ-উপবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। গোত্র, বংশ, বর্ণ সম্পর্কে লালন সাঁইয়ের শ্রদ্ধাহীনতা কেবলমাত্র ভাবাবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। লালনের ধর্মমত ছিল অতি সরল ও উদার। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের তিনি সমভাবে গ্রহণ করতেন।

লালন সাঁইকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তিনি নিজের পথ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হননি। লালন সাঁই কোনো ধর্মমতকে কখনও আঘাত করতেন না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষার কথা উদার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

সমগ্রভাবে তিনি মানুষকেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মৌলিক সত্য বলে স্বীকার করেছেন । লালনের বাউল তত্ত্বে স্রষ্টা 'বস্তু' স্বরূপ মানব দেহে অধিষ্ঠিত। তিনি স্বর্গে মহাশূন্যে বা অপর কোনো কাল্পনিক লোকে অবস্থিত নন। তার নৈকট্য লাভ করতে হলে মানুষের দেহের ভিতরই অন্বেষণ করতে হবে। সেই অনুসন্ধান বা উপায় জানেন গুরু বা মুরশিদ। বস্তুবাদী দর্শন মানব-শক্তিকে করেছে আস্থাবান ও মানব মহিমায় উজ্জ্বল। মরমী কবি লালনের প্রধান কৃতিত্ব এখানেই।

মরমী কবি লালনসাঁইয়ের সাধনার ন্যায় তার গানগুলোও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধনার ক্রম-অনুযায়ী লালন সাঁইয়ের বাউল গান চার স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তর আবার চৌদ্দটি শাখায় বিভাজ্য। এভাবে লালনগীতি সমগ্রভাবে মোট ছাপান্ন শাখায় ভাগ করা যায়। কিন্তু কাব্যগত ঐতিহ্য ধারায় এসব গান তিনভাগে বিভক্ত করাই শ্রেয় বলে মনে হয়।

১। বাউল গীতির ঐতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি।

২। সুফীবাদের ঐতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি।

৩। বৈষ্ণব পদাবলির ঐতিহ্য ধারায় রচিত লালনগীতি।

এই তিন ঐতিহ্য ধারায় রচিত লালন গীতি দেহতত্ত্ব-সমর্পিত হলেও কেউ কেউ প্রথম শ্রেণির গানকেই শুধু বাউল গান বা দেহতত্ত্বমূলক গান বলে নির্দেশ করতে ইচ্ছুক। আবার সুফীবাদী ঐতিহ্য ধারায় লালনগীতিকে তারা ইসলামী মরমীয়া সংগীত নামে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। আর বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙ্গে রচিত লালনগীতিকে তারা বলতে চান বৈষ্ণব পদাবলি। কিন্তু তিনি যেকোনো পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে গান রচনা করুন না কেন, সর্বত্রই দেহের জয়গান ও বাউল মনোভাবের আধিপত্য বিদ্যমান। এই কারণে লালনগীতি অন্য গান নয়। এই গান শুধু বাউল গান।

লালন সাঁইয়ের কিছু বিখ্যাত গানের কলি নিম্নে বর্ণিত করা হলো:

১। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।

২। আছে দীন দুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা।

৩। ভক্তের দ্বারে বাধা আছে সঁই, হিন্দু কি যবন বলে, জাতের বিচার নাই।

৪। চিরদিন পোষলাম এক অচিন পাখি।

৫। কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।

৬। জাত গেল জাত গেল বলে, একি আজব কারখানা।

৭। বাড়ির কাছে আরশী নগর।

৮। খাচার ভিতর অচিন পাখি।

৯। পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে।

১০। গুরু আমারে রাখবেন ক'রে চরণ দাসী।

১১। কে তোমার আর যাবে সাথে।

১২। পারে লয়ে যাও আমায়।

১৩। সময় গেলে সাধন হবে না

১৪। সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন।

১৫। মন সহজে কি সই হবা।

১৬। ধন্য ধন্য বলি তারে।

১৭। আপন ঘরের খবর নে না।

১৮। চাতক স্বভাব না হ'লে।

১৯। পাখি কখন যেন উড়ে যায়।

২০। দেখনা মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারী।

শেষ জীবনে লালন সাঁই দিনে একবার মাত্র আহার করতেন। ছেঁউড়িয়ায় তাঁর সযত্নে তৈরি একটি পানের বরজ ছিল। তিনি প্রত্যহ একশোটি করে পান গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্লেশের জন্য তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। তাঁর মাথায় লম্বা চুল ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন, এবং হাতে পায়ে জলস্ফীত দেখা দেয়। এই সময় তিনি দুধ ছাড়া কিছুই খেতেন না। মৃত্যুর পূর্বের রাত্রে তিনি প্রায় সমস্ত রাত গান করেছিলেন। রাতের শেষ প্রহরে তিনি শিষ্যদের বললেন, 'আমি চললাম'। এর কিছুক্ষণ পরই তার শ্বাস রোধ হয়। তার আখড়ার ভেতর একটি ঘরে এই মহান প্রতিভাধর মরমী সাধক কবি লালন শাহের সমাধি স্থাপন করা হয়। বর্তমানে লালন সাঁইয়ের সমাধি কুষ্টিয়া শহরের অদূরে 'ছেঁউড়িয়া' নামক স্থানে বিদ্যমান। লালন সাঁইয়ের সমাধি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর ১ কার্তিক বাউল মেলায় বাউল গানের আসর বসে। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বড়ো বড়ো সাধক ও বাউলগণ এই মেলায় যোগদান করেন।

রাধারমণ দত্ত (১২৪১-১৩২২ বঙ্গাব্দ)

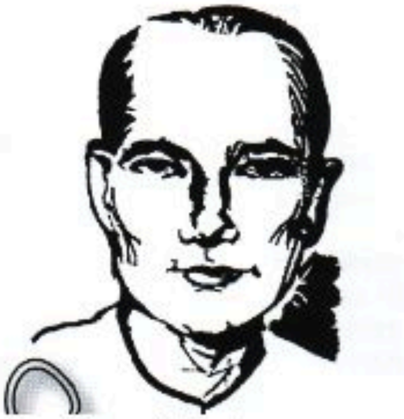

চিত্র: রাধারমণ দত্ত

সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ছিলেন বীরভুম জেলার অধিবাসী চক্রপাণি দত্তের বংশোদ্ভূত। চক্রপাণি দত্ত ছিলেন তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত। চক্রপাণি দত্ত সিলেটের রাজা প্রথম গোবিন্দকেশব দেব (ভাটেরা তাম্রশাসন অনুযায়ী ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে) এর চিকিৎসার জন্য তিন পুত্রসহ সিলেটে আসেন। পরবর্তীকালে তার দুই পুত্র সিলেটে থেকে যান কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রসহ বীরভূমে ফিরে যান। আর এভাবেই চক্রপাণি দত্তের বংশধরেরা পরম্পরায় সিলেটে বসবাস করতে থাকেন।

সাধক কবি রাধারমণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আতুয়াজান পরগণার কেশবপুর গ্রামে। পিতার নাম রাধামাধব দত্ত এবং মায়ের নাম সুবর্ণা দেবী। রাধামাধব দত্ত- এর তিন পুত্র ছিল রাধানাথ, রাধামোহন ও রাধারমণ। পিতা রাধামাধব ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের স্বচ্ছন্দ টীকা, ভারত সাবিত্রী ও ভ্রমরগীতা এবং বাংলা ভাষায় কৃষ্ণলীলা কাব্য, পদ্মপুরাণ, গোবিন্দভোগের গান, সূর্যব্রত পাঁচালী রচনা করেন। রাধারমণ দত্ত ১২৫০ বঙ্গাব্দে কৈশোরেই পিতৃহারা হন। তিনি ১২৭৫ বঙ্গাব্দে গুণমাইয়ী দেবীকে বিয়ে করেন। রাধারমণ এর চারপুত্র– রাসবিহারী, নদীয়বিহারী, বিপিনবিহারী ও রসিকবিহারী। কিন্তু তিন পুত্র অকালে মারা যায়, শুধুমাত্র বিপিনবিহারী দত্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন।

সাধক রাধারমণ দত্ত ছোটোবেলা থেকেই ঈশ্বর সাধনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব মতের বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মৌলভীবাজারের নিকটবর্তী ঢেউপাশা গ্রামের সাধক রঘুনাথ গোস্বামীর সান্নিধ্যে এসে দীক্ষা গ্রহণ করে বৈষ্ণব সহজিয়া পদ্ধতিতে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। সহজ সাধনার প্রথম স্তরেই রাধারমণ গৃহত্যাগী হন। নলুয়ার হাওর সংলগ্ন একটি নির্জন

স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনায় ব্রতী হন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আজও প্রচলিত রয়েছে।

রাধারমণের গান বিশ্লেষণ করলে বৈষ্ণব পদাবলির পদবিন্যাসরীতি গানে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব তত্ত্বানুসারে তিনি রচনা করেছেন প্রার্থনা, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, গুরুভক্তি বিষয়ক পদ। কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের ভিত্তিতে পদ রচনা করেছিলেন যেমন– গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, দৌত্য, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি। এছাড়া বৈষ্ণব পঞ্চরসের, মহাভাবের, কৃষ্ণপ্রেমের ও নাম-মাহাত্ম্যের গীতিরূপ তিনি রচনা করেছিলেন।

গুরুভক্তি না থাকলে সাধনা হয় না। রাধারমণের গুরুভক্তি বিষয়ক পদে একথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। যেমন– 'অজ্ঞান মন গুরু কি ধন চিনলায় না'; 'ও গুরুর পদে মনপ্রাণ দিলাম নারে'; 'কাঙাল জানিয়া পার কর দয়ালগুরু'; গুরু একবার ফিরি চাও, অধম জানিয়া গুরু সাধন শিখাও প্রভৃতি গান। গুরু সাহায্য ছাড়া এই ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি আকুল কণ্ঠে গুরুর প্রতি প্রার্থনা করেছেন।

আবার বৈষ্ণব তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ নামে মন নিবিষ্ট করার কথা বলেছেন। যেমন–'হরি বলে ডাক মন রসনা'/'হরে কৃষ্ণ নামজপ অবিরামে নামে বিরাম দিও না'; 'হরে কৃষ্ণ নাম বলরে মন' প্রভৃতি গানে।

রাধারমণ বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক হলেও পদ রচনায় তিনি সংকীর্ণতা পরিহার করে চলেছেন। বিভিন্ন ভাবের সহজ সরল সমন্বয় তার গানে পাওয়া যায়। যেমন–শ্যামাসংগীত বা মালসী গান, ত্রিনাথ বন্দনা, বিয়ের গান, রূপসীব্রতের গান, বা যেকোনো সমসাময়িক ঘটনা সম্বলিত গান আমরা পাই। রাধারমণের একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানের সঙ্গে আমাদের সবারই কমবেশি পরিচয় রয়েছে:

'ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে
অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে ভ্রমর ভ্রমর কইও গিয়া'

রাধারমণের গানে মানবিক সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, বিরহ মিলন মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাধারমণের গান সাধারণ গ্রামের মানুষ পালা-পার্বণে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, কৃষিকাজ করতে করতে গেয়ে থাকেন। ধামাইল গান বলতে রাধারমণের গান বোঝায়। ধামাইল সিলেট অঞ্চলের নিজস্ব নৃত্যগীতি। গ্রামে বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, সাধভক্ষণ, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, সূর্যব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে রাধারমণের গান ধামাইল নৃত্যের সাথে পরিবেশিত হয়। ধামাইল গানের নমুনা: উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–

১। কেন গো রাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া
২। জলে যাইও না গো রাই

সাধক রাধারমণ এর গানের সংখ্যা আজও অনির্দিষ্ট। অনেক গবেষক দু'হাজার বা তিন হাজার গান রচনা করেছেন বলে দাবি করেন। রাধারমণের গানের বাণী প্রায়ই পরিবর্তিত কারণ তিনি নিজে হাতে কোনো গান লেখেননি। সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই গাইতেন। আর সেই সঙ্গে শিষ্য-প্রশিষ্যরা তার গান শুনে শিখতেন এবং আশ্রমে পরিবেশন করতেন। পরে হয়ত অনেকে সেই গান সংগ্রহ করে লিখেছেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্তিক শুক্রবার সাধক কবি রাধারমণ দত্ত ইহধাম ত্যাগ করেন। কেশবপুরে তার নিজ বাড়িতে মরদেহ ভস্মীভুত না করে বৈষ্ণবমতে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিতে এখনও প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে কীর্তন করে ভক্তবৃন্দরা তাঁকে স্মরণ করেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৭০-১৯৭২)

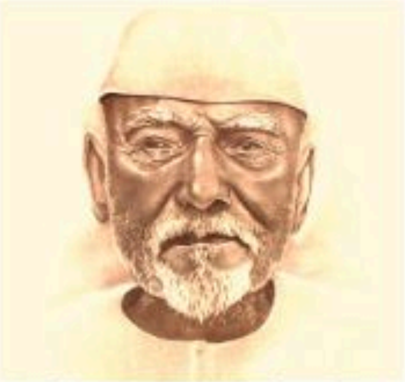

চিত্রঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, হিন্দুস্তানি সংগীতের ধারায় এক প্রবাদ প্রতিম নাম। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে, বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে। পিতা সংগীতজ্ঞ সবদর হোসেন খাঁ ওরফে সদু খাঁ, আর মাতা সুন্দরী বেগম। সদু খাঁর পাঁচ পুত্র ছমির উদ্দিন খাঁ, আফতাব উদ্দিন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খাঁ ও আয়েত আলী খাঁ। পিতা সেতার বাজাতেন। পুত্র আলাউদ্দিনকে আদর করে 'আলম' নামে ডাকতেন। বাল্যকাল থেকেই আলাউদ্দিনের সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে। বড়ো ভাই ফকির আফতাব উদ্দিনের কাছে তার হাতে খড়ি। ছোটো বেলায় তাঁর সংগীত প্রীতি ছিল অধিক। তিনি ছিলেন সুরের পাগল। সুরের অমোঘ আকর্ষণে অতি অল্প বয়সে সকলের অগোচরে, সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়া হন। সামান্য পাথেয় সম্বল করে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে পাশের গ্রামে এক যাত্রা দলে এবং পরে ঢাকা হয়ে কোলকাতায় পৌঁছান।

কোলকাতায় তিনি স্বনাম ধন্য গায়ক নুলো গোপালের সান্নিধ্যে আসেন এবং কণ্ঠসংগীতে তালিম নিতে শুরু করেন। নুলো গোপাল তাকে শর্ত দেন যে, ১২ বছর তাকে কেবল স্বর সাধতে হবে তারপর রাগের তালিম নিতে পারবেন। আলাউদ্দিন সেখানে কঠোর সাধনায় ৭/৮ বৎসর কাটান। তাঁর সংগীত শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু হঠাৎ গুরু মারা গেলেন। গুরুর মৃত্যুতে আলাউদ্দিন নিদারুণ আঘাত পেলেন। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন কণ্ঠসংগীত সাধনা আর করবেন না। এবার শিখবেন যন্ত্রসংগীত।

আলাউদ্দিন খাঁ এই সময়ে অমৃতলাল দত্ত ওরফে হাবু দত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাবু দত্তের একটি অর্কেস্ট্রা দল ছিল, নাট্যকার গিরিশ ঘোষের নাট্যদলে এর বাজনা হতো। তিনি দিনের বেলায় সংগীতের তালিম নিতেন এবং রাতে অর্কেস্ট্রার দলে বাজাতেন। সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুদিন চাকরিও করেছিলেন। কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের তালিম তিনি এ সময়ে গ্রহণ করেন। গোয়ানীজ লরো সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে এবং অমর দাশের কাছে হিন্দুস্তানি রীতিতে বেহালা বাজানো শেখেন। মৃদঙ্গ বাদক নন্দবাবুর কাছে পাখওয়াজ এবং হাজারী ওস্তাদের কাছে সানাই শেখেন। হাবু দত্তের কাছে তিনি ক্লারিওনেট বাজানোর তালিম নেন। এভাবে তিনি সর্ববাদ্যে বিশারদ হয়ে ওঠেন।

এমন সময় আলাউদ্দিন খাঁ, মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) রাজা জগৎ কিশোরের দরবারে সংগীত পরিবেশনের আহ্বান পেলেন। রাজদরবারে তিনি সে যুগের যশস্বী সরোদ বাদক ওস্তাদ আহমদ আলী খাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ওস্তাদ আহমদ আলীর বাজনা শুনে তাঁর কাছে সরোদ শেখার জন্য আলাউদ্দিনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। মহারাজা তাকে ওস্তাদ আহমদ আলীর শিষ্য করে দেন। দীর্ঘ চার বছর তিনি গুরুর কাছে সরোদ বাদনের তালিম নেন।

আলাউদ্দিন খাঁ তানসেন বংশীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওয়াজির খাঁর কাছে সংগীতের তালিম নেন। ওয়াজির খাঁ ছিলেন রামপুরের [ভারতের উত্তর প্রদেশে] সভাবাদক। পরে বহু কৌশলে তিনি ওয়াজির খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ

করতে সক্ষম হন। কিন্তু শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেও দুই তিন বৎসর তিনি [ওয়াজির খাঁ]। কিছুই শেখান নাই আলাউদ্দিন খাঁকে। আলাউদ্দিন খাঁ অপেক্ষা করতে থাকেন তালিমের জন্য, শেষ পর্যন্ত তার অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটে। ওয়াজির খাঁ আলাউদ্দিন খাঁ কে তালিম দিতে শুরু করেন। সুদীর্ঘকাল ওয়াজির খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর ওয়াজির খাঁ আলাউদ্দিনকে স্বাধীনভাবে সংগীত চর্চার অনুমতি দেন। আলাউদ্দিন খাঁ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে চলে আসেন কোলকাতায়।

১৯১৮ সালে মাইহার এর রাজা ব্রজনাথ আলাউদ্দিনের কাছে সংগীত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে গুরুর পদে বরণ করে মাইহারে নিতে সক্ষম হন। তারপর থেকে বাকী জীবন তিনি সেখানেই কাটান। ১৯৩৪-৩৫ সালে উদয় শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন। অবাক করেন বিদেশি শ্রোতাদের তার অগাধ পাণ্ডিত্যে। ব্রিটিশ সরকার তাকে 'খাঁ সাহেব' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের সংগীত নাটক একাডেমির শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি সংগীত নাটক একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৭২ সালে 'পদ্মবিভূষণ রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতে অতুলনীয় অবদানের জন্য তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলাউদ্দিন খাঁ বেশ কয়েকটি নতুন রাগ প্রণয়ণ করেন। সেগুলো হচ্ছে– হেমন্ত, শোভাবতী, উমাবতী, নাগার্জুন, দুর্গেশ্বরী, মেঘ-বাহার, প্রভাতকেলী, হেম বিহাগ, মদন মঞ্জুরী প্রভৃতি। সরোদ যন্ত্রের সংস্কার ছাড়াও তিনি চন্দ্র সারং নামে একটি সংগীত যন্ত্র উদ্ভাবনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সংগীতের আচার্যরূপে আলাউদ্দিন খাঁ কিংবদন্তিতুল্য গৌরব লাভ করেছেন। কৃতী শিষ্যমণ্ডলি গঠন করে তিনি তাঁর সংগীত ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলির মধ্যে যারা বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে–পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খান, কন্যা রওশন আরা ওরফে অন্নপূর্ণা, জামাতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর, তিমিরবরণ, পান্নালাল ঘোষ, শ্যাম গালী, নিহার বিন্দু চৌধুরী, দ্যুতিকিশোর আচার্যচৌধুরী, ভ্রাতুস্পুত্র ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, নিখিল ব্যাণার্জী, শরণ রাণী মাধুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মাইহার রাজ্যে তার নিজস্ব বাসভবনে [মদিনা ভবন] শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আলাউদ্দিন খাঁর সংগীত জীবন ছিল যেমন সুদীর্ঘ তেমনি ঘটনাবহুল। আমাদের সংগীতের ধারায় তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, সংগীত সাধনার পথ প্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণার উৎস।

মোমতাজ আলী খান

মোমতাজ আলী খান ১৩২৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার এবং সিংগাইর থানার ইরতা কাশিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আফসার উদ্দীন খান। আফসার উদ্দীন অত্যন্ত সৌখিন লোক ছিলেন। তিনি গ্রামে প্রচুর জমি-জমার মালিক ছিলেন। একদিন তিনি লোকমুখে কলের গানের কথা শুনলেন। গ্রামের মানুষ তখন কলের গান শোনেও নি, দেখেওনি। মোমতাজ আলী খানের বাবা একটি কলের গান কিনে আনেন। আফসার উদ্দীন সাহেবের গ্রামের বাড়িতে কলের গান আসার খবর পেয়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা বাড়িতে এসে ভিড় জমালো। সবাই প্রাণভরে অনেক গান শুনল– সেদিন কিশোর মোমতাজও একাগ্রচিত্তে প্রথম কলের গান শুনলেন। তখন থেকেই মোমতাজকে গানের নেশায় পেয়ে বসল। তিনি গান শেখাবার জন্য মনে মনে দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ হলেন। এ সময় তিনি দূরের গ্রামে সারারাত জেগে যাত্রাগান, কবিগান, শোনার জন্য যেতেন।

সারারাত গান শুনে এসে নিজে নির্জন স্থানে বসে খালি গলায় গান গাইতেন। এ ছাড়া বাড়ি বাড়ি ঘুরেও সেসব গানগুলো গাইতেন। সামাজিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মোমতাজ এতটুকু বিচলিত হননি। তিনি চলে যান কোলকাতা মেজ ভাই-এর বাসায়।

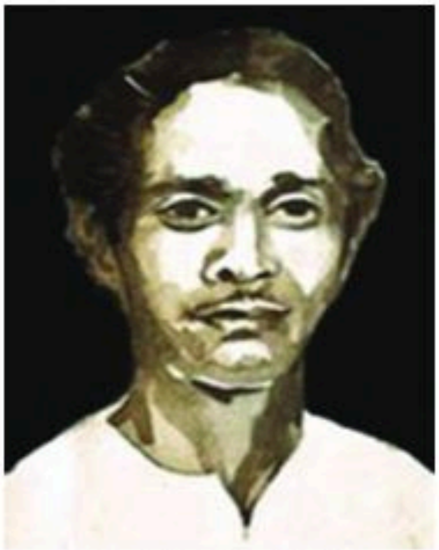

চিত্রঃ মোমতাজ আলী খান

মোমতাজ যে বাড়িতে থাকতেন একদিন সে বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এলো গানের সুর। মমতাজ ভিতরে গিয়ে দেখলেন তার গ্রামের অনেককে। তারা মমতাজকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। গানের আসরে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি হলেন ওস্তাদ নেছার হোসেন। তিনি মোমতাজের গান শুনে প্রশংসা করলেন এবং গান শিখবার জন্য অনেক উৎসাহ দিলেন। ওস্তাদ নেছার সাহেব চলে যাওয়ার সময় মোমতাজকে গান শিখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং নিজের বাসার ঠিকানাও দিয়ে গেলেন।

এরপর সংগীত-পাগল মোমতাজ পরের দিনই ওস্তাদ নেছার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। এভাবেই ওস্তাদের বাড়িতে মোমতাজ গানের তালিম নেওয়া শুরু করলেন।

এভাবেই একদিন দেখা হয়ে গেল ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু সাহেবের সাথে। খসরু সাহেব মোমতাজ-এর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হলেন এবং মোমতাজকে ডেকে বললেন, চাকরি করবেন কি না? তখন মোমতাজ জিজ্ঞেস করলেন, কিসের চাকরি? ওস্তাদ খসরু সাহেব বললেন গানের চাকরি। এতে মোমতাজ অবাক হয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, গানের আবার চাকরি হয় নাকি? মমতাজ রাজি হলেন, চাকরি করার জন্য ওস্তাদ খসরু মোমতাজকে নিয়ে এলেন 'সংগীত প্রচার বিভাগে'। কবি জসীমউদ্দীন তখন এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। কবি বললেন, গানের চাকরির পদ আপাতত খালি নেই, তবে যন্ত্রী হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। ইতোমধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটে গেল। মোমতাজের গ্রাম থেকে একজন লোক কোলকাতায় এলেন এবং তার হাতে ছিল একটি সুন্দর দোতারা। মমতাজ এক টাকা আট আনা দিয়ে দোতারাটি কিনে ঘরে এনে এক নাপিতের কাছে দোতারা বাজানো তালিম নিতে লাগলেন। ইতোমধ্যে একদিন ওস্তাদ নেছার সাহেব ব্যাপারটা জানতে পেরে তিনি নিজেই মমতাজকে দোতারায় তালিম দিতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়েই মোমতাজ দোতারা বাজনায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এই শিক্ষাকে সম্বল করেই তার চাকরি হয়ে গেল– 'সংগীত প্রচার বিভাগে' দোতারা-বাদক হিসেবে। আব্বাসউদ্দিন আহমদ, আবদুল আলীম এবং শেখ লুতফুর রহমান গাইতেন আর দোতারা বাজাতেন মোমতাজ আলী খান।

এরপরও তিনি সংগীত শিল্পী হওয়ার দুরন্ত বাসনা সযত্নে লালন করে রাখতেন বুকের মাঝে। একবার 'সংগীত প্রচার বিভাগে'র এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। কিন্তু অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা মাইকের

কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। তার ফলে শ্রোতাদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এই সময় মোমতাজ অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য কবি জসীমউদ্‌দীন সাহেবের কাছে অনুরোধ জানালেন। কবি মোমতাজকে গান গাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। মোমতাজ অপূর্ব কণ্ঠে ধরলেন ভাটিয়ালি গান। শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন, তাঁর গান শুনে। গান শেষ হওয়ার পর কবি জসীমউদ্‌দীন সাহেব খুশি হয়ে মোমতাজকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। এরপর তার গায়ক হিসেবে চাকরি হয়ে গেল 'সংগীত প্রচার বিভাগে'।

পরে আর একটি অনুষ্ঠানে মোমতাজের গান শুনলেন তৎকালীন 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র অনুষ্ঠানের প্রযোজক সাদেকুর রহমান সাহেব। তিনি মোমতাজের গান শুনে তাঁকে রেডিওতে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিতে বললেন। মোমতাজ যথাসময় রেডিওতে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। এরপর থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম করতে থাকেন (অল ইন্ডিয়া রেডিওতে)। এটা আনুমানিক ১৯৪৩/১৯৪৪ সালের কথা। এরপর সাদেকুর রহমান সাহেব মোমতাজকে নিয়ে গেলেন গ্রামোফান কোম্পানিতে। সেখানে মোমতাজ রেকর্ড করলেন দুইটি গান। গান দুইটি হলোঃ

১। ও শ্যাম বন্ধুরে তোর লাইগ্যা
মোর প্রাণ কান্দেরে।

২। রাধে ভাবিলে আর কি হবে,
শ্যাম তোমারে ফাঁকি দিয়াছে।

সেই সময়ে রেকর্ডকৃত গান দুইটি প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়। তিনি গানের রয়েলটি (সম্মানী) পেলেন আটশত টাকা। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। এরপর ১৯৫০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইতোমধ্যে তিনি 'সংগীত প্রচার বিভাগ এর' চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে রেডিওতে যোগদান করেন। সেই সময়ে রেডিও পাকিস্তান ছিল পুরানো ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডে। পরে ১৯৬০ সালে রেডিও পাকিস্তান স্থানান্তরিত করা হয় শাহবাগে। তিনি দীর্ঘদিন রেডিওতে চাকরি করেন এবং ১৯৬৫ সালে রেডিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যোগদান করেন তৎকালীন পি. আই. এ-এর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে আর্টস একাডেমিতে। চাকরি নিয়ে তিনি চলে গেলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান)। ১৯৭১ সালে মাত্র বারো দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ঢাকায়। এর মধ্যে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। তিনি আর ফিরে গেলেন না পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মোমতাজ আলী খান যোগদান করলেন বাংলাদেশ বিমানে। তিনি সরকারি সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে বহুবার বিভিন্ন দেশে গান পরিবেশন করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছেন।

মোমতাজ আলী খান সুরারোপিত অসংখ্য জনপ্রিয় গান তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত পরিবেশন করে থাকেন। তার অনেক গান শিল্পীরা রেকর্ড করেছেন এবং তিনি নিজেও বহুগান রেকর্ড করেছেন। ১৯৮১ সালে তাকে রাষ্ট্রীয় 'একুশে পদক' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
সংগীত সাধক মোমতাজ আলী খান ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট মারা যান।

আবদুল লতিফ (১৯২৫-২০০৬)

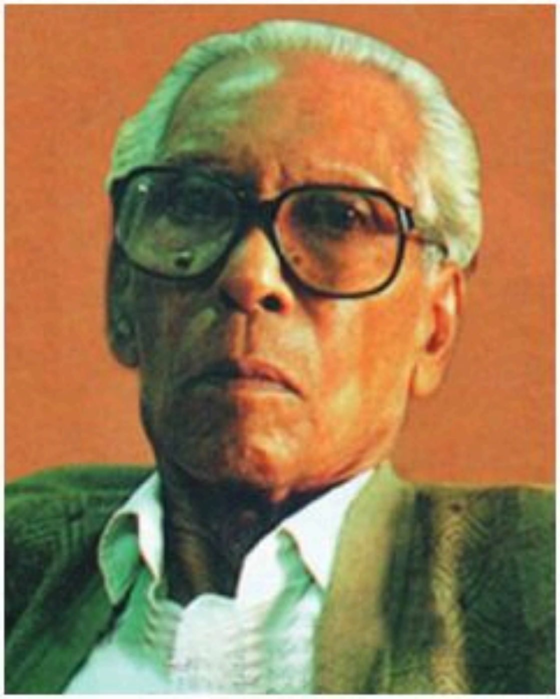

চিত্রঃ আবদুল লতিফ

আবদুল লতিফ ছিলেন একাধারে সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। তিনি বরিশালের রায়পাশা গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ছোটোবেলা থেকেই গানের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণ তাঁর গ্রামে তাঁকে গায়ক হিসেবে পরিচিত করে তোলে। গান গাওয়ার অপরাধে তার ফুফু তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ফুফুর কাছে। গানগুলো ছিল ইসলাম বিরোধী। কিশোর আবদুল লতিফ এ-ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত না হয়ে অবিশ্বাসের সঙ্গে ফুফুকে একটি গান শোনাতে চান এবং তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন। আবদুল লতিফ আল্লাহ-রসুলের প্রশংসায় ভরা আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া নজরুলের একটি ইসলামি গান গেয়ে শুনান। গান শুনে ফুপু মুগ্ধ হন এবং তাঁকে গান গাওয়ার অনুমতি দেন। এভাবেই পারিবারিক স্বীকৃতি নিয়ে আবদুল লতিফের শিল্পীজীবনের শুরু।

আবদুল লতিফ যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি ১৯৩৯ সালে ১৬ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান ইন্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স এ নির্বাচিত হন। ছয়মাস পর এ ব্যাটেলিয়ন ভেঙে দেওয়া হয়। পরে তিনি কোলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ না দিলেও তিনি রাজনীতি সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দেন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে তিনি কোলকাতার কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে যোগ দেন সংস্থার অফিস ছিল কোলকাতার গোপাল মল্লিক লেনে। রাজনীতি সচেতন নতুন শিল্পীদের এখানে গান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। গান শেখাতেন সুকৃতি সেন। আবদুল লতিফও তাঁর কাছে গান শেখেন।

আবদুল লতিফ কোলকাতা থেকে ১৯৪৮ সালে ঢাকা আসেন। এখানে বিখ্যাত গায়ক ও সংগীত পরিচালক আবদুল হালিম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে হিন্দু শিল্পী-গীতিকারদের দেশত্যাগের ফলে পূর্ববাংলায় বড়ো রকমের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ সঙ্কট মুক্তির লক্ষ্যে তিনি আবদুল লতিফকে গান লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি প্রথমে আধুনিক গান ও পরে লেখেন পল্লিগীতি ।

আবদুল লতিফের মেজাজে গণসংগীতের উপাদান ছিল। সেটা তাঁর প্রথম জীবনের কোলকাতা- পর্বেই পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে কোরাসে তারা যেসব গান গাইতেন, তা ছিল গণসংগীত। এটা ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। বরিশালের গ্রামীণ জীবনধারার লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর মানসজগত ছিল গভীরভাবে প্রোথিত। কীর্তন, পাঁচালি, কথকতা, বেহুলার ভাসান, রয়ানি গান, কবিগান, গুনাই যাত্রা, জারি-সারি, পালকির গান প্রভৃতি সংগীতের সুরকে তিনি নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। তাঁর গানগুলোতে পূর্ব-বাংলার অধিকার বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গান–'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়। এ-গানটিতে তিনি বাংলাদেশের

লোকসংগীতের আবহ ও সুরকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গানটি পূর্ববাংলার ঐতিহ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক প্রতীকী গানের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

আবদুল লতিফ ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে সূচনালগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সৈনিকও তিনি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'—এই বিখ্যাত গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ (পরে শহিদ আলতাফ মাহমুদ গানটির নতুন সুর করেন)। ঐ সময়ে গানটি গাওয়ার পর তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর রোষাণলে পড়তে হয়েছিল তাকে।

আবদুল লতিফ কেবল সংগীত শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন গণসংগীতের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, গীতিকার, সুরকার ও ভাষাসৈনিক। পুঁথিপাঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে। তিনি কাল ও যুগ সচেতন সময়োপযোগী অনেক গানও রচনা করেছেন। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি লিখেন: 'দুঃখের দইরা হইবা যদি পার দেখো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর/হাল ধইরা বইসা নৌকায়...।' এ ছাড়া সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটি'; 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা/কারো দানে পাওয়া নয়; তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলিসহ অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানের রচয়িতা তিনি। আবদুল লতিফ যখন গান গাইতেন, দর্শক-শ্রোতারা সে গানের মধ্যে খুঁজে পেতেন চেতনাময় প্রতিবাদের ভাষা। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি শতাধিক সম্মাননা ও পদক পেয়েছেন। পেয়েছেন মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তিনি ১৯৭১ সালে পেয়েছেন একুশে পদক এবং ২০০২ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।

আবদুল লতিফ সংগীতের নানা শাখায় বিচরণ করেছেন। বাল্যকাল থেকে গ্রামবাংলার জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান, সংগীতকলার সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর নিজের মধ্যে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। উদার ও মানবিক মূল্যবোধে আবদুল লতিফের সংগীতে পরিস্ফুট হয় অসাম্প্রদায়িক লৌকিক গণচেতনা।

তাঁর লিখিত গান সব সংগ্রহ করা যায়নি। তবে তাঁর তিনটি গানের বই পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে তাঁর 'ভাষার গান', 'দেশের গান'। এতে আছে বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত চব্বিশটি গণসংগীত ও দেশের গান একান্নটি; দুটি জারি এবং আটটি মানবাধিকার সম্পর্কিত গান। তাঁর অন্য দুটি বইয়ের নাম 'দুয়ারে আইয়াছে পালকি' (মরমী গান) এবং 'দিলরবাব'। গণমানুষের মহান এই শিল্পী ২০০৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু বরণ করেন। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এবং গানের ভুবনে আবদুল লতিফের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

আবদুল আলীম (১৯৩১-১৯৭৪)

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংগীত হচ্ছে তার লোকসংগীত। নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক-বাহক হলো লোকসংগীত যা গণমানুষের নিজস্ব সৃষ্টি ও ঐতিহ্য। সমৃদ্ধ লোকসংগীত উজ্জ্বল জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের পল্লিগানের ইতিহাসে আবদুল আলীম এক অবিস্মরণীয় নাম। কণ্ঠস্বরের অসাধারণ সহজাত ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। আবদুল আলীম যখন গান গাইতেন তখন মনে হতো পদ্মা, মেঘনার ঢেউ উছলে পড়ছে শ্রোতার বুকের পাঁজরে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে আবদুল আলীম যে গান গাইতেন, সে শুধু বাংলা ভাষা-ভাষীদের মনেই নয়, বিশ্বের সকল সুররসিক-যারা ভাষা জানেন না—তাদেরও আপ্লুত করতো।

শিল্পী আবদুল আলীম ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ ইউসুফ আলী মাতার নাম খাসা বিবি। শিল্পীর বয়স যখন ১০-১১ বছর

চিত্রঃ আবদুল আলীম

তখন তাঁর এক সম্পর্কিত চাচা গ্রামের বাড়িতে কলের গান (গ্রামোফোন) নিয়ে আসেন। তিনি তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদ বরকত তাঁর সহপাঠী। প্রায় প্রতিদিনই তিনি চাচার বাড়িতে গিয়ে গান শুনতেন। পড়াশোনার জন্য গ্রামের স্কুল তাঁকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। তাই কিশোর বয়সেই শুরু করলেন সংগীত চর্চা। আবদুল আলীমের নিজ গ্রামেরই সংগীত শিক্ষক সৈয়দ গোলাম আলীর (ওলু মিয়া) কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। ওস্তাদ তাঁর ধারণ ক্ষমতা নিরীক্ষণ করে খুবই আশান্বিত হলেন। গ্রামের লোক আবদুল আলীমের গান শুনে মুগ্ধ হতো। পালা-পার্বণে তাঁর ডাক পড়ত। আবদুল আলীম গান গেয়ে আসর মাতিয়ে তুলতেন। সৈয়দ গোলাম আলী, আবদুল আলীমকে কোলকাতা নিয়ে গেলেন। কিছুদিন কোলকাতা থাকার পর তাঁর মন ছুটল ছায়াঘন পল্লিগ্রাম তালিবপুরে। কিন্তু ওখানে গান শেখার সুযোগ কোথায়? তাই বড়ো ভাই শেখ হাবিব আলী একরকম ধরে বেঁধেই আবার কোলকাতা নিয়ে গেলেন।

তখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৪২ সাল। মরহুম শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এলেন কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। বড়ো ভাই শেখ হাবিব আলী তাঁকে নিয়ে গেলেন সেখানে। শিল্পীর অজ্ঞাতে বড়ো ভাই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কাছে নাম দিয়ে দিলেন গান গাইবার জন্য। এক সময় মঞ্চ থেকে আবদুল আলীমের নাম ঘোষণা করা হলো। শিল্পী ধীর পায়ে মঞ্চে এসে গান ধরলেন, ‘সদামন চাহে মদিনা যাবো।’ হক সাহেব মঞ্চে বসে। আবদুল আলীমের গান শুনে শেরে বাংলা শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। কিশোর আবদুল আলীমকে জড়িয়ে নিলেন বুকে। উৎসাহ দিলেন, দোয়া করলেন এবং তখনই বাজারে গিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি, জুতা, টুপি, মোজা সব কিনে দিলেন। এরপর একদিন গীতিকার মোঃ সুলতান কোলকাতায় মেগাফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেলেন আবদুল আলীমকে। সেখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কবি নজরুল শিল্পীর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রেকর্ড কোম্পানির ট্রেনার ধীরেন দাসকে আবদুল আলীমের গান রেকর্ড করার নির্দেশ দিলেন। ১৯৪৩ সালে মোঃ সুলতান রচিত দুটি ইসলামি গান আবদুল আলীম রেকর্ড করলেন। গান দুটি হলো–

১। আঁধার এলো ছেয়ে চল ফিরে চল মা হালিমা আফতাব ঐ বসলো পাটে আছেরে পথ চেয়ে।

২। তোর মোস্তফারে দেনা মাগো সংগে লয়ে যাই, মোদের সাথে মেষ চারিলে ময়দানে ভয় নাই।

তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলো। দেশে বিভাগের একমাস আগে আবদুল আলীম কোলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ঢাকা এলেন। পরের বছর ঢাকা বেতারে

অডিশন দিলেন। অডিশনে পাশ করলেন। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখ তিনি বেতারে প্রথম গাইলেন 'ও মুর্শিদ পথ দেখাইয়া দাও'। আবদুল আলীম পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে পরিচিত হলেন। কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁকে পাঠালেন জিন্দাবাহার ২য় লেনের ৪১ নম্বর বাড়িতে। সে সময় নামকরা সব শিল্পীরা থাকতেন ঐ বাড়িতে। সেখানে তিনি প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী মোমতাজ আলী খানের কাছে তালিম গ্রহণ করেন। মোমতাজ আলী খান আবদুল আলীমকে পল্লি গানের জগতে নিয়ে এলেন।

এদেশের পল্লিগান হলো মাটির গান। পল্লির কাদা মাটির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা শিল্পী আবদুল আলীম মাটির গানকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন। এর আগে তিনি ইসলামিগানসহ প্রায় সব ধরনের গান গাইতেন। শেখার ক্ষেত্রে আর যারা তাঁকে সবসময় সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে– বেদার উদ্দীন আহমেদ, আবদুল লতিফ, কানাইলাল শীল, শমশের আলী, হাসান আলী খান, ওসমান খান, আবদুল হালিম চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি ওস্তাদ মোঃ হোসেন খসরুর কাছে শাস্ত্রীয়সংগীতেরও তালিম গ্রহণ করেন।

১৯৫২-৫৩ সালে আবদুল আলীম কোলকাতায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে গান গেয়ে এদেশের বাইরে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এসময় পল্লি জগতে শিল্পীর সুখ্যাতি শীর্ষচূড়ায়। তিনি ১৯৬২ সালে বার্মায় অনুষ্ঠিত বার্মীয় সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বার্মায় তখন অনেকদিন যাবত ভীষণ খরা চলছে। গরমে মানুষের প্রাণ বড়োই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আকাশেও খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা। শিল্পী অন্যান্যদের সাথে মঞ্চে উঠলেন গান গাইতে। গান ধরলেন 'আল্লা মেঘ দে পানি দে।' কী আশ্চর্য! গান শেষ হলেই মুষল ধারে বৃষ্টি নামলো। অনুষ্ঠানে বার্মার জনৈক রাজনৈতিক নেতা বললেন, 'আবদুল আলীম আমাদের জন্য বৃষ্টি সাথে করে এনেছেন'। তখন থেকে শিল্পী বার্মার জনগণের নয়নমণি হয়ে আছেন। সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হয়ে তিনি ১৯৬৩ সালে রাশিয়া, ১৯৬৪ সালে আফগানিস্তান এবং ১৯৬৬ সালে চীন সফর করেন। তিনি প্রায় ১০০টি ছায়াছবিতে গান গেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি গুলো হলোঃ মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬), জোয়ার এলো (১৯৬২), রূপবান (১৯৬৫), আপন দুলাল (১৯৬৬), সুজন সখি (১৯৭৩) । আবদুল আলীমের ভরাট গলা, তাঁর কণ্ঠের খাদ ও উপরে দিকে কণ্ঠের চলন এক নতুন মাত্রা পায়। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে– হলুদিয়া পাখী সোনারই বরণ, দুয়ারে আইসাছে পাল্কী নাইওরি গাও তোলো, নাইয়ারে নায়ে বাদাম তুইলা, এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া, পরের জাগা পরের জমিন, প্রেমের মরা জলে ডোবে না অন্যতম। তিনি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের প্রথম ছবি 'মুখ ও মুখোশ'–এ কণ্ঠ দেন। তার স্ত্রীর নাম জমিলা খাতুন। তিনি সাত সন্তানের জনক। তিন পুত্র–জহির আলীম, আজগর আলীম ও হায়দার আলীম। চার কন্যা– আখতার জাহান আলীম, আসিয়া আলীম, নূরজাহান আলীম ও জোহরা আলীম। এঁরা সকলেই সংগীত শিল্পী।

এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৪০০-৫০০ গান রেকর্ড হয়েছে। এছাড়া বেতার স্টুডিও রেকর্ডে প্রচুর গান আছে। বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি (ঢাকা রেকর্ড) শিল্পীর একটি লংপ্লে রেকর্ড বের করেছে। তিনি জীবদ্দশায় ও মরণোত্তর বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে একুশে পদক (১৯৭১), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, পূর্বাণী চলচ্চিত্র পুরস্কার, বাচসাস পুরস্কার ও স্বাধীনতা পদক (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য। নিখিল পাকিস্তান সংগীত সম্মেলনে পেয়েছিলেন ৫টি স্বর্ণ পদক। তিনি সংগীত কলেজ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই লোকসংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পল্লিগানের যে ধারা তিনি প্রবর্তন করে গেছেন সেই ধারাই এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। তিনি পল্লি গানের এক আদর্শবান গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল আলীম তাঁর গানের মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন সংগীত পিপাসু মানুষের মাঝে।

স্বামী হরিদাস

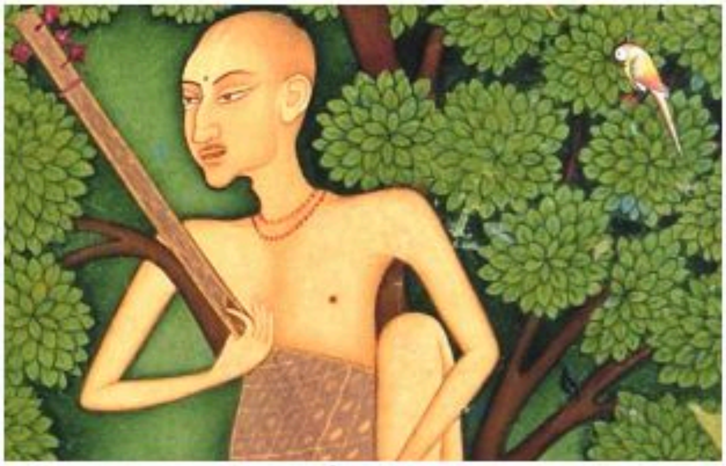

চিত্রঃ স্বামী হরিদাস

উত্তর প্রদেশের আলীগড় জেলার একটি গ্রামে স্বামী হরিদাসের জন্ম 'ভক্তসিন্ধু' গ্রন্থে তাঁর জন্ম ১৪৪১ খ্রিস্টাব্দে উল্লেখ রয়েছে। কেউ বলেন ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবার কারও মতে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো স্বামী আশুধীর এবং মাতার নাম গঙ্গা। আশুধীর মুলতান জেলার উচ্চশ্রেণির সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বিশেষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

তবে স্বামী হরিদাস আশুধীর স্বামীর পুত্র ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের মতে, হরিদাস ছিলেন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ এবং আশুধীর সারস্বত ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। তাই পুত্র নয় পুত্রসম ছিলেন বলাই হয়তো ঠিক হবে। তবে প্রথম মতটিই অধিকাংশ ব্যক্তি সমর্থন করেন।

সংগীতের সংস্কার নিয়েই হরিদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর সাধক জীবনে সংগীত ঈশ্বর সাধনার পথে একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে বৃন্দাবনে চলে যান। অতঃপর কৃষ্ণ ভজনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। হরিদাস ছিলেন নিঃস্বার্থক-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বৃন্দাবনে হরিদাসের নামানুসারে 'হরিদাসী সম্প্রদায়' নামে একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তিনি বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারীর মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। বৃন্দাবনের নিধুবন নিকুঞ্জে একটি ছোটো কুটিরে সাধন-ভজন করেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সে সময় অন্যান্য দু'একজন হরিদাসেরও খোঁজ পাওয়া যায়, সেজন্য হরিদাস স্বামীকে বলা হতো 'আসুকো হরিদাস'।

হরিদাস স্বামী ব্রজ ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গের কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি গানে রাগরূপকে তিনি অবিকৃত রেখে সুরারোপ করেছেন এবং তালকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। শাস্ত্রীয়সংগীতে যথাযথ প্রচারের জন্য তিনি যে শিষ্যমণ্ডলি তৈরি করেছিলেন, উত্তরকালে তারা সকলেই সংগীতের জগতে এক একজন দিকপাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে তানসেনই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্যদের মধ্যে রাজা শৌরসেন, দিবাকর পণ্ডিত, সোমনাথ পণ্ডিত, রামদাস, বৈজু বাওরা, গোপাল লাল, মদন রায় প্রমুখের নাম উল্লেযোগ্য।

ধর্ম প্রচারের জন্য সুরারোপ করে নৃত্যসহযোগে তিনি বৃন্দাবনে রাসের পদগানের যে প্রচলন করেন তাই বর্তমান কালের বজ্রধামের রাসলীলা। কেবল রাসলীলা নয় তিনি হোলি গানেরও উন্নততর প্রবর্তক। একই সঙ্গে

বাদ্য এবং নৃত্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেছিলেন। তিনি ১৫শ শতাব্দীর পরিবর্তিত ধ্রুবপ্রবন্ধাবলিকেই গ্রহণ এবং ভগবানের গুণকীর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন।

হরিদাস স্বামীর নামে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যেমনঃ 'হরিদাসজী কো' গ্রন্থ, 'স্বামী হরিদাসজী কো পদ' ইত্যাদি। তবে এই গ্রন্থগুলো তাঁর নামে অন্য কারও রচিত কিনা জানা যায় না। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বারীণ মজুমদার (১৯২১-২০০১)

চিত্রঃ বারীণ মজুমদার

আগ্রা ও রঙ্গিলা ঘরানার যোগ্য উত্তরসাধক বারীণ মজুমদার ১৯২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাবনার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিশেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাতা মনিমালা মজুমদার। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংগীত শিক্ষার শুরু হলেও ১৯৩৮ সালে কোলকাতায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই প্রথম রীতি অনুযায়ী সংগীতের তালিম নিতে শুরু করেন। পুত্রের সংগীতের প্রতি আগ্রহ দেখে পিতা জমিদার নিশেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ থেকে ওস্তাদ রঘুনন্দন গোস্বামীকে নিয়ে আসেন এবং বারীণ মজুমদারের ওস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে ১৯৩৯ সালে লক্ষ্ণৌ-এর 'মরিস কলেজ অব মিউজিক' এ সরাসরি তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন এবং বি. মিউজ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মরিস 'কলেজ অব মিউজিক' থেকে 'সংগীত বিশারদ' ডিগ্রি অর্জন করেন। ইতোমধ্যে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, অধ্যাপক জে. এন. নাটু, ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ প্রমুখ সংগীতজ্ঞের কাছে তালিম নেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে ওস্তাদ খুরশীদ আলী খাঁ, চিন্ময় লাহিড়ী, আফতাব-এ-মৌসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছ থেকে সংগীতের তালিম নেন।

১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় বারীণ মজুমদার চিরস্থায়ীভাবে পাবনায় চলে আসেন। ১৯৫২ সালের জমিদারি হুকুম দখল আইনের বলে ১৮ বিঘা জমির ওপর নির্মিত তাঁদের বসতভিটাসহ সব পৈতৃক সম্পত্তি সরকারি দখলে চলে যায়। সম্পত্তিহীন এ বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। ওই বছরেই বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। এসময় তিনি সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে দেশে একটি মিউজিক কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংগীত বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করেন। উল্লেখ্য ১৯৫৭ সাল থেকেই তিনি

ঢাকা বেতারে নিয়মিত শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করেছেন। ক্রিয়াপরতার সঙ্গে সৃজনশীলতার সংযোগে তিনি অধীত বিদ্যার একটি নিজস্ব পরিবেশনকলা রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন।

বারীণ মজুমদার ১৯৬৩ সালের ১০ নভেম্বর কাকরাইলের একটি বাসায় মাত্র ৮৭ টাকা, ১৬ জন শিক্ষক এবং ১১ জন ছাত্র-ছাত্রীর সহায়তায় দেশের প্রথম (কলেজ অব মিউজিক) এর কার্যক্রম শুরু করেন। তাছাড়া তিনি শাস্ত্রীয়সংগীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 'মনিহার সংগীত একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬৫ সাল থেকে তিনি নিয়মিত ঢাকা টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণির শিল্পী হিসেবে শাস্ত্রীয়সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ডিগ্রি ক্লাসের সিলেবাস তৈরি করে সংগীত মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে পরিণত করেন এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিষয়ক পরীক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে সংগীত কলেজের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে ওস্তাদ নাজাকত আলী, সালামত আলী, ওস্তাদ আমানত-ফতেহ্ আলী, ওস্তাদ মেহেদী হাসান, ওস্তাদ আসাদ আলী খাঁসহ বহু গুণিশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আলাউদ্দিন সংগীত সম্মেলন' আয়োজন করেন। ১৯৭৩ সালে শিক্ষা কমিশনের অধীন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন করেন এবং এই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের অডিশন ও গ্রেডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন 'একক সংগীতানুষ্ঠানে' গান পরিবেশন করেন। ১৯৮২ সাল থেকে দীর্ঘ সময় তিনি 'সুর সপ্তক' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি অনেক সম্মাননা ও পদকে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালে তাঁকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের বেসামরিক খেতাব 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। একই বছর 'বরেন্দ্র একাডেমি' তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে। তিনি ১৯৮৮ সালে বারীণ মজুমদার 'কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট পুরস্কার' ও ১৯৯০ সালে 'সিধু ভাই স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৯১ সালে শিল্পকলা একাডেমি তাঁকে গুণিজন সম্মাননা প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালের জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদ তাঁকে 'রবীন্দ্রপদক'-এ ভূষিত করে। ১৯৯৫ সালে বেতার টেলিভিশন শিল্পী সংসদ তাঁকে 'শিল্পী-শ্রেষ্ঠ' খেতাব প্রদান করে। ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে সম্মাননা পত্র প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালে বারীণ মজুমদারকে 'বাংলা একাডেমির ফেলোশিপ' প্রদান করা হয়। ১৯৯৮ সালে বারীণ মজুমদার 'জনকণ্ঠ গুণিজন সম্মাননা' পদক লাভ করেন। ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করে। রাগসংগীত ও সংগীত শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বারীণ মজুমদার বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাছাড়া তিনি 'সংগীত' ও 'সুর লহরী' নামে দুটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ২০০১ সালের ৩ অক্টোবর এ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

উলফগ্যাং আমাদিউস মোজার্ট (১৭৫৬-১৭৯১)

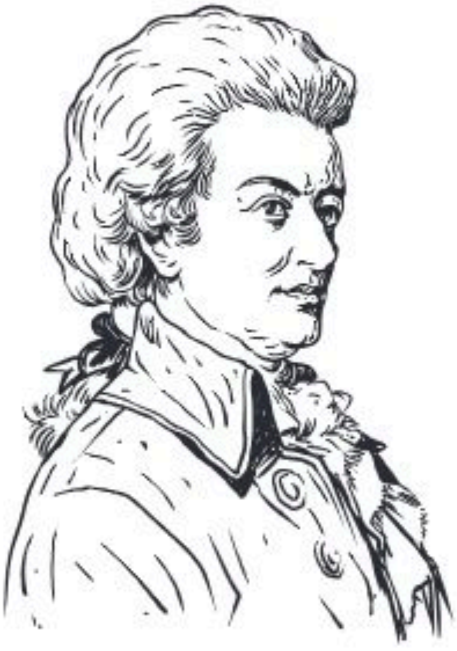

চিত্র: উলফগ্যাং আমাদিউস মোজার্ট

ক্লাসিক্যাল যুগের অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী একজন সংগীতকার। তিনি ১৭৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পূর্ণনাম উলফগ্যাং আমাদিউস মোজার্ট। তিনি ৬০০ এর অধিক সংগীত রচনা করেন। অস্ট্রিয়ার সাল্টসবুর্গ শহরে খ্যাতিমান সংগীত শিক্ষক লিওপোল্ড-এর ঔরসে তার জন্ম। বিস্ময়কর এই প্রতিভা মাত্র তিন বছর বয়সে পিয়ানোতে কঠিন সুর বাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তার সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই হাপসিকর্ড বাজাতে শেখেন এবং ছোটো ছোটো অথচ চমকপ্রদ মিনিউয়েট রচনা করতে সমর্থ হন। বারো বছরের আগেই তিনি চিত্তাকর্ষকভাবে বেহালা, অর্গান প্রভৃতি বাজানোর দক্ষতা অর্জন করেন। তের বছর বয়সে তিনি ইতালি ভ্রমণ করেন। সেখানে রোমের এক গীর্জায় একটি ধর্মীয় স্তোত্রসংগীত একবার শুনে সেটিকে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করে সুধীজনের মাঝে বিস্ময় সঞ্চার করেন। তের বছর বয়সে তিনি অপেরা রচনা করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সাল্টস বুর্গের আর্চবিশপের বাড়িতে চাকুরি নেন। কিন্তু তার সৃজনশীলতা প্রথাগত পুরোহিতদের ঈর্ষার কারণ হওয়ায় চাকুরি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ছাব্বিশ বছর বয়সে মোজার্ট। কনস্ট্যানজ আলয়শিয়াকে বিবাহ করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অধিকাংশ সৃষ্টি করেন। অপেরা 'ম্যারেজ অব ফিগারো' ও 'ডন জিয়োভানি' সে সময় রচিত হয়। বিবাহের পর অমিতব্যয়ী পরিবারের চাপে সংসার খরচ চালাতে মোজার্টকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। এতে তাঁর নিজের সৃজনশীলতা ব্যহত হয় এবং অর্থাভাব ও অতিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ে। ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে মোজার্টের বয়স তখন ছত্রিশ। তখন তিনি মৃত্যুযাত্রী। ভিয়েনার গৃহে শুয়ে বসে কঠোর পরিশ্রম করে মৃত আত্মাদের শান্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত রেকুইয়েম রচনা করেন। এই রেকুইয়েম রচনা করতে করতে মধ্য রাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অর্থাভাব এবং অবহেলাই মূলত তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ। তার নিথর দেহ ভিয়েনার শহরতলীতে দরিদ্র ভিখারীর মত সমাধিস্থ করা হয়। গীর্জার ধর্মানুষ্ঠান শেষে গণসমাধিতে তাঁকে ফেলে রেখে আসে সৎকার সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারীগণ। আজও তার সমাধির সন্ধান মেলেনি।

সমসাময়িক ও পরবর্তী সকল সংগীতকারই মোজার্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে সংগীতে শুদ্ধতার প্রতীকরূপে আখ্যায়িত করেছে। রিচার্ড হ্বাগনার তাঁকে মহত্তম ও স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী বলেছেন। সিম্ফনি, অপেরা, কনচার্টো, স্ট্রিং-কোয়ার্টেট, চেম্বার, কোরাল প্রভৃতি রচনায় মোজার্ট যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। সেই গভীর ও শাশ্বত সৌন্দর্যচেতনার স্বাক্ষর তাঁকে কালজয়ী সম্মান এনে দিয়েছে। মোজার্ট ছিলেন সুরের আধ্যাত্মিক রূপকার। তাঁর শিল্পবোধ ছিলো সর্বদা শাশ্বতের প্রতি নিবদ্ধ। ফলে অশেষ পার্থিব যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি অপার্থিব সৌন্দর্য সন্ধানের এক মহান স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

সেতার

সেতার অত্যন্ত প্রচলিত ও জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। আমাদের দেশে দুইরকম সেতারের প্রচলন রয়েছে। একটি হলো সাধারণ ও অপরটি তরফদারি। সাধারণ সেতার মূলত শিক্ষার্থীরাই ব্যবহার করে থাকে। এতে মাত্র সাতটি তার থাকে। তন্মধ্যে তিনটি পিতলের এবং চারটি লোহার তার।

সেতারের প্রথম তারটি লোহার। মূল তার বলে একে 'নায়কী' তার বলা হয়ে থাকে। 'নায়কী' তারকে উদারা সপ্তকের মধ্যম বা মা স্বরে বাঁধতে হয়। পরের দুটি পিতলের তারকে 'জুড়ি' তার বলা হয়ে থাকে এবং এ দুটিকেই উদারার ষড়জ বা সা স্বরে বাঁধতে হয়। চতুর্থ তারটিও পিতলের। সেটিকেও উদারার ষড়জ স্বরে তথা জুড়ির সুরের সাথে মিলিয়ে বাঁধতে হয়। এর পরের লোহার তারটি সাধারণত পঞ্চমে বাঁধা হয়। তবে বিভিন্ন রাগ বা রাগিণী বাজাবার ক্ষেত্রে শিল্পীরা এ তারটিকে নিজের ইচ্ছেমতো সুরেও বেঁধে নিতে পারেন। তার পরের তার দুইটিকে বলা হয় 'চিকারী' তার। সাধারণত মুদারার ষড়জ অথবা তারার ষড়জে এ দুইটি তারকে বাঁধতে হয়।

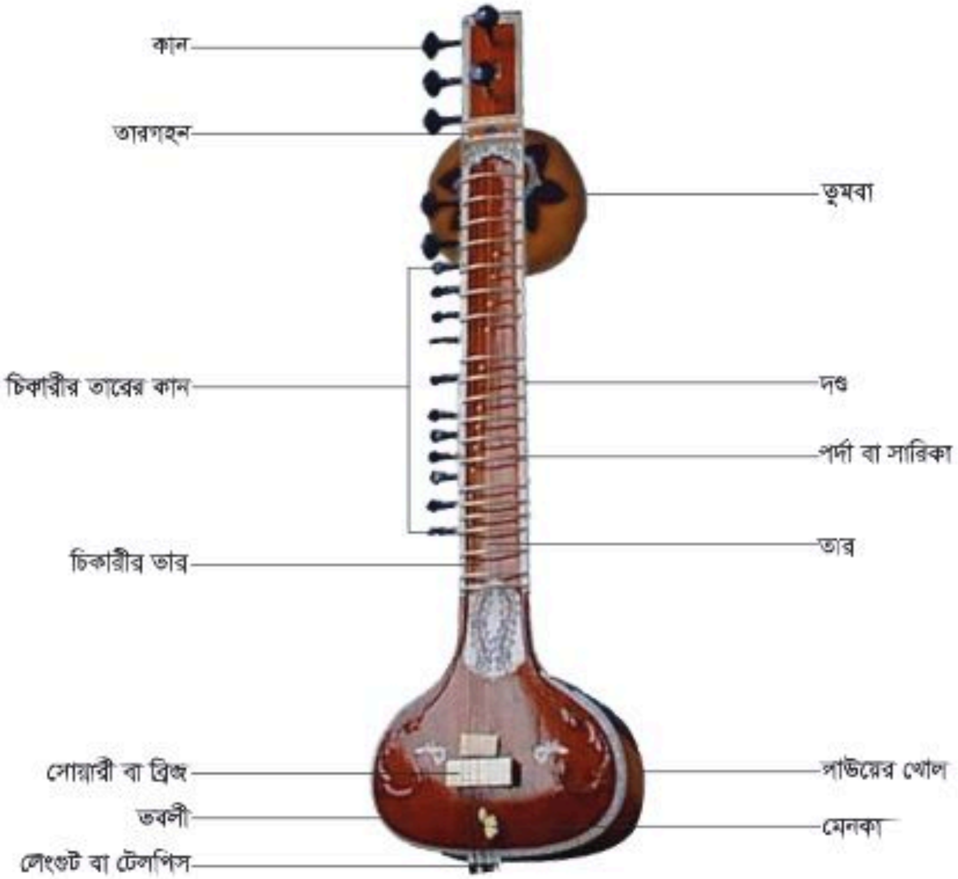
কান
তারগহন
তুম্বা
চিকারীর তারের কান
দণ্ড
পর্দা বা সারিকা
তার
চিকারীর তার
সোয়ারী বা ব্রিজ
লাউয়ের খোল
তবলী
মেনকা
লেংগুট বা টেলপিস

চিত্রঃ সেতার

সেতারে সতেরটি পর্দা বা সারিকা থাকে। সে পর্দাগুলো দণ্ডের সাথে শক্ত সুতার সাহায্যে বাঁধা থাকে। এই পর্দাগুলো বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে চেপে ডান হাতের তর্জনীতে মিজরাব লাগিয়ে তারে আঘাত করে বাজানো হয়।

সরোদ

সরোদ তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দোতারা আর রবাব নামক দুইটি বাদ্যযন্ত্র থেকে সরোদ যন্ত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছে। 'সেহরুদ' শব্দ থেকে সরোদের নামকরণ করা হয়েছে। সরোদ কাঠের তৈরি। প্রায় সোয়া চারফুট লম্বা ও একফুট চওড়া একখানা কাঠের টুকরা খোদাই করে সরোদ তৈরি করা হয়। সরোদের উপরের অংশ দণ্ড। দণ্ডের বুকে একটি ইস্পাতের পাত আটকানো হয়। এটাকে পটরী বলে। পটরীর নিচের অংশকে খোল বলে। খোলটি গোলাকৃতি এবং চামড়ার ছাউনি দিয়ে আচ্ছাদিত। খোলের শেষ প্রান্তে একটি লেংগুট লাগানো থাকে। ছাউনির ওপর থাকে দেয়ারী। পটরীর বুকে ছিদ্র করে পিতলের কীলক লাগানো হয়। এই কীলকের ভেতর দিয়ে তরফের তারগুলো সংযোজিত হয়। সরোদের মাথার দিকে থাকে তারগহন ও আটটি বয়লা। বয়লা থেকে সোয়ারী ও তারগহনের ওপর দিয়ে প্রধান প্রধান তারগুলো লেংগুটের সঙ্গে আটকানো। তরফের এগারোটি তারের জন্য সরোদের গায়ে আরও এগারোটি ছোটো চ্যাপ্টা বয়লা লাগানো হয়। তার পাশে দুইটি চিকারী তারের জন্যে দুইটি বয়লা থাকে। সরোদে মোট একুশটি তার থাকে। তার মধ্যে আটটি প্রধান। দুইটি চিকারী ও এগারোটি তরফের তার। সরোদের উপরের দিকে মাথার নিচে একটি তুম্বা লাগানো থাকে। ডান হাতে জওয়া ধরে বাঁ হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে পটরীর বুকে তার চেপে সরোদ বাজাবার নিয়ম। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরামর্শে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সরোদের বর্তমান আধুনিক রূপ দেন।

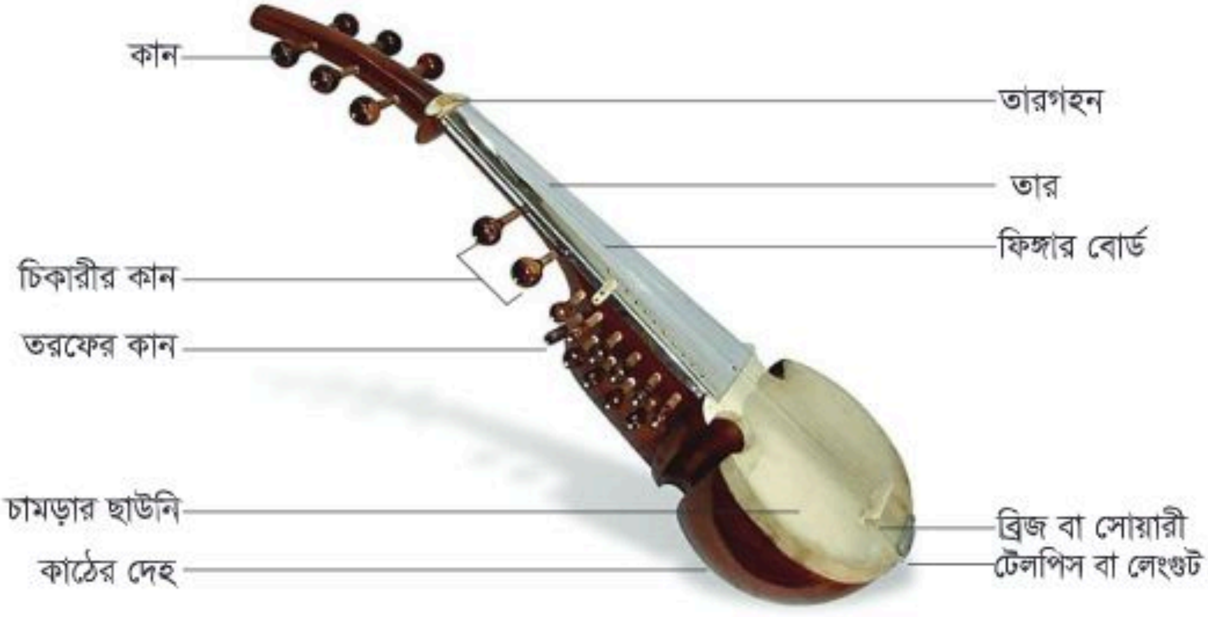

চিত্র: সরোদ

সারেঙ্গী

সারেঙ্গী ততযন্ত্র। সারেঙ্গী দেখতে একটা নিরেট কাষ্ঠ খণ্ডের মতো। একটি নিরেট কাষ্ঠ খণ্ড খোদাই করে সারেঙ্গী তৈরি করা হয়। উপরের ফাঁপা অংশ দণ্ড এবং নিচের অংশ খোল। খোলের শেষ প্রান্তে লেংগুট লাগানো থাকে। খোলটি চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাকা। চামড়ার ছাউনির ওপর সোয়ারী বসানো। সারেঙ্গী প্রায় সাতাশ ইঞ্চি লম্বা। এতে চারটি প্রধান তার ব্যবহার করা হয়। এই তারগুলো তাতের। চারটি কাঠের বয়লাতে এই তারগুলো লাগানো থাকে। বয়লা চারটি দণ্ডের মাথার দিকে দুইপাশে আটকানো। দণ্ডের মাথার দিকে তারগহন থাকে। সারেঙ্গীতে পঁয়ত্রিশটি তরফের তার আছে। তরফের তারগুলো পটরীর বুকে সংযুক্ত কীলকের ভেতর দিয়ে লেংগুট পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান হাতে ছড় টেনে সারেঙ্গী বাজানোর নিয়ম। ছড়টি দেখতে অনেকটা

অর্ধচন্দ্রের মতো। গজল, কাওয়ালি, টপ্পা, ঠুমরি, খেয়াল ইত্যাদি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

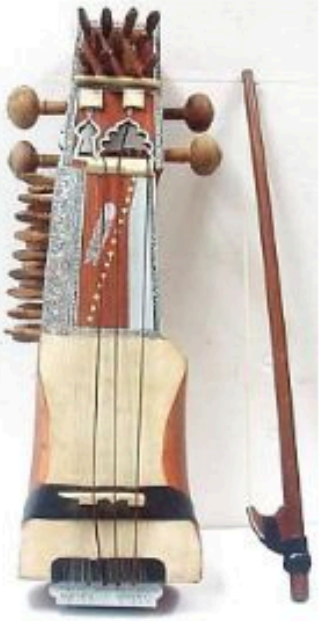

চিত্র: সারেঙ্গী

পাখওয়াজ

পাখওয়াজ একটি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন মৃদঙ্গ থেকেই পাখওয়াজের সৃষ্টি হয়েছে। পাখওয়াজ ফার্সি শব্দ। পখ (পবিত্র) আওয়াজ (ধ্বনি) শব্দ থেকে পাখওয়াজ নামের উৎপত্তি। পাখওয়াজ একটি মধুর গম্ভীর আওয়াজ বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। রক্ত চন্দন নিম কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এর দৈর্ঘ্য দেড় হাত থেকে পৌনে দুই হাত। এর মধ্যভাগের পরিধি দুই মুখের পরিধি থেকে কিছু বেশি। বাঁ দিকে মুখের ব্যাস বারো থেকে চৌদ্দ আঙুল এবং ডান দিকের মুখের ব্যাস নয় থেকে দশ আঙুল। পাখওয়াজের দুই মুখ চামড়ার ছাউনি দিয়ে আবৃত। দক্ষিণ মুখের মাঝখানে বৃত্তাকারে খিরণ দেওয়া থাকে। বাঁ হাতের চামড়ায় আচ্ছাদিত মুখে ময়দা লাগানো থাকে। চামড়ার আচ্ছাদন দুইটি চর্মরজ্জু দ্বারা টান করা থাকে এবং ঐ রজ্জুর নিচে আটটি কাঠের গুলি দেওয়া থাকে। এই গুলিগুলো পাখওয়াজের সুর বাঁধতে সাহায্য করে। যন্ত্রের দুই মুখে আটার প্রলেপ লাগাবার রীতিও আছে। বর্তমান মৃদঙ্গের সঙ্গে পাখওয়াজের আকৃতিগত পার্থক্য আছে। বীণা, রবাব, সুরবাহার, ধ্রুপদ ও ধামারের সঙ্গে পাখওয়াজ বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

তবলার প্রচলন পাখওয়াজের জনপ্রিয়তাকে অনেকাংশে হরণ করেছে। মুঘল আমলে পাখওয়াজ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। নৃত্যগীত এবং বাদ্যে সমভাবেই এটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে গান ছাড়া বিভিন্ন বাদ্যের সঙ্গেও (যেমন– সুরশৃঙ্গার, বীণ, রবার প্রভৃতি) পাখওয়াজ সংগত করা হয়ে থাকে।

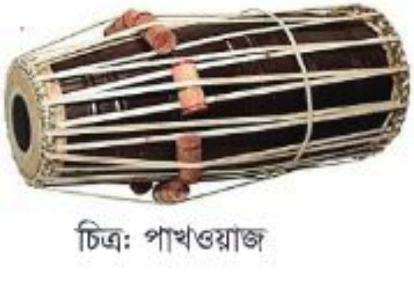

চিত্র: পাখওয়াজ

খমক

বাংলা লোকবাদ্যের মধ্যে খমক অন্যতম। এটি দশ-বারো ইঞ্চি ব্যসযুক্ত কাঠের তৈরি লোক বাদ্যযন্ত্র। এর নিচের দিকে চামড়ার ছাউনীযুক্ত। সেই ছাউনীর মধ্যভাগে একটি ছিদ্র করে সেখানে একটি পিতলের আংটা সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। তারের অপর প্রান্ত সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ এটি কোনো চাবি বা কানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে এই উন্মুক্ত প্রান্তে তারটিকে ক্ষুদ্র একটি মন্দিরা জাতীয় হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। বাদনের সময় এই খমকের দেহটিকে বাঁ হাতের বগলদাবা করে তারটির উন্মুক্ত প্রান্তের হাতিলটিকে বাঁ হাতের মুষ্টি বদ্ধ করতে হয়। একই সময়ে ডান হস্তস্থিত একটি ছোটো আরশির সাহায্যে খমকের তারটিকে আঘাত করে বাম হাতের মুষ্টিবদ্ধ হাতলটাকে টান প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে খমকে সৃষ্টি হয় এক বিচিত্র ভঙ্গীর সুর। দেহতত্ত্ব মুর্শিদি, বাউল, মারফতি গানে এই যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি।

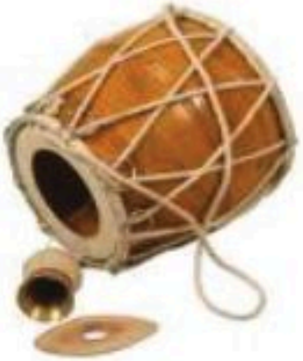

চিত্রঃ খমক

সারিন্দা

সারিন্দা একটি লোকবাদ্যযন্ত্র। বিচার গান, মারফতি, মুর্শিদি গানে বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি লম্বায় দুই ফুট। আস্ত এক কাঠের খণ্ডকে কেটে এবং নিচের দিকে খোদাই করে তৈরি হয় যন্ত্রটি। সম্পূর্ণ অংশে চামড়ার ছাউনী হয় না বরং ক্ষুদ্র এক সরু অংকে চামড়ার ছাউনী সংযুক্ত। সারিন্দা এক ঘর্ষণবাদ্য অর্থাৎ তারে ছড়ের ঘর্ষণ প্রয়োগ করে বাদ্যটিকে সুর তোলা হয়। মাত্র তিনটি তার। দোতারার মত সারিন্দার উপরি ভাগ খোদাই থাকে। সাধারণত একটি পাখির আকৃতি লোকজধারার এই বাদ্যযন্ত্রে দেখা যায়।

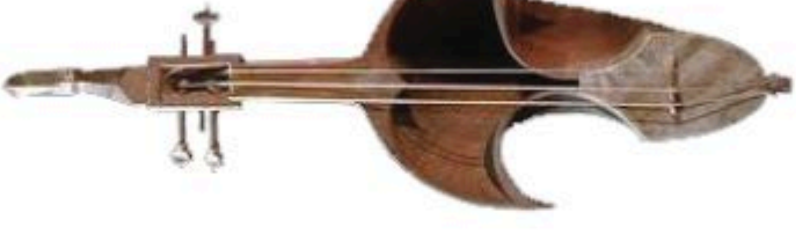

চিত্রঃ সারিন্দা

বেহালা

বেহালা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এ যন্ত্রটি যদিও ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র বলে খ্যাত হলেও আমাদের দেশে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। বেহালার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। একমতে, প্রায় চারশ বছর আগে ইউরোপে 'ভাইল নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ভাইল থেকেই 'ভায়োলিন বা বেহালা' যন্ত্রের সৃষ্টি।

অন্যমতে, মধ্যযুগে ভেনিস নগরে লীনাবোলি নামে এক গ্রাম্য ব্যক্তি 'টেনর ভায়োলিন' নামক একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। পরে ইতালির কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই টেনর ভায়োলিনের সংস্কার সাধন করে 'ভিয়ালো' যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজরা বেহালাকে 'ভায়োলিন' বলেন আর ইতালিয়ানরা বলেন 'ভিয়ালো'। সেই ভায়োলিন বা ভিয়ালোই বেহালা নামে সুপরিচিত।

অপর দিকে আরব ও পারস্যে 'কেমান্জে জৌজ' নামক এক প্রকার ধনুর্যন্ত্রের প্রচলন ছিল। ফারসি ভাষায় 'কেমান্জে জৌজ' (Kemangeh a gouz) শব্দে প্রাচীন ধনুর্যন্ত্রকে বোঝায়। পারস্য অভিধানে 'কেমানেজ' শব্দ 'ভিয়ল' বলে অনুবাদিত আছে। তা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে কেমান্জে জৌজ' বা 'ভিয়ল' অথবা 'বেহালা' পারসিক যন্ত্র।

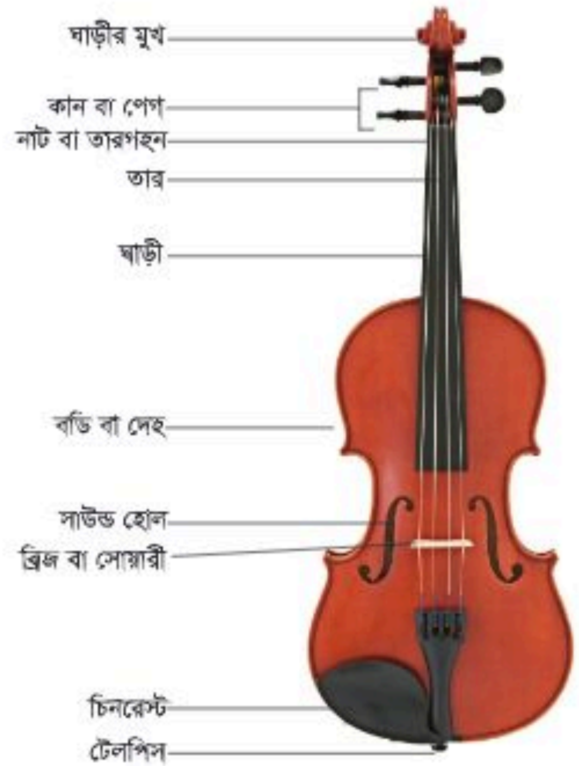

চিত্র: বেহালা

স্টিক বা ছড়ি

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আরব দেশে প্রচলিত 'রিবেক' নামক ধনুর্যন্ত্র থেকে বেহালার উৎপত্তি। আরব জাতি তখন স্পেন বিজয় করেন তখন তাদের সাথে অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে রিবেক যন্ত্রটিও ইউরোপের সংগীত জগতে আবির্ভূত হয়। রিবেক যন্ত্রটি কেমান্জে জৌজ যন্ত্রেরই গোত্রভুক্ত। কাজেই রিবেক থেকে বেহালার উৎপত্তি একথাও অস্বীকার করা যায় না। এসব প্রমাণ থেকে এই বোঝা যায় যে, তিন তার বিশিষ্ট আরবীয় যন্ত্র রিবেক এবং রবাবের অনুকরণেই ইতালিতে প্রথম ভিয়েলের সৃষ্টি হয়। পরে ইতালির লম্বার্ডির অন্তর্গত 'সাল'

নামক নগরে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে গাসপর্ড নামক একজন শিল্পী 'ভায়োলিন' বা বেহালার বর্তমান আকৃতি দান করে তাতে চারটি তারের ব্যবহার প্রচলন করেন। এখনও এ নিয়মই প্রচলিত।

কতকগুলো হালকা কাঠের অংশকে জোড়া দিয়ে বেহালা যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। সম্পূর্ণ যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ফুট যন্ত্রটি প্রধানত 'ঘাড়ী' এবং 'খোল' এই দুই অংশে বিভক্ত। খোল অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁপা। বেহালাতে চারটি কান, একটি নাট বা তারগহন, একটি ফিঙ্গার বোর্ড, একটি ব্রিজ, একটি টেলপিস, একটি এ্যাডজাস্টার, একটি বোতাম, একটি সাউন্ডপোস্ট ও একটি চিনরেস্ট থাকে। এর মাথাটি চ্যাপ্টা ও মোড়ানো। কানগুলো লাগানো হয় মাথার দুই পাশে। ঘাড়ীর উপরিভাগে একটি হালকা কাঠ আবদ্ধ থাকে। এই কাঠটিকে বলা হয় ফিঙ্গারবোর্ড। তারগহনাটি বসানো থাকে ফিঙ্গারবোর্ড এর ওপর প্রান্তে, আর বোতামটি থাকে খোলের শেষ প্রান্তে। টেলপিসের মাথায় চারটি ছিদ্র থাকে। এ্যাডজাস্টারগুলো আবদ্ধ থাকে ঐ ছিদ্রে। পরে এ্যাডজাস্টার সংযুক্ত টেলপিসটিকে গাঁটের তৈরি সুতোর সাহায্যে খোলের শেষ প্রান্তে আবদ্ধ বোতামের সঙ্গে আটকিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিজটি বসানো থাকে টেলপিস ও ফিঙ্গারবোর্ড এর মাঝখানে যে খালি জায়গাটুকু আছে সেখানে। তারগুলো সংযোজিত হয় কান এবং এ্যাডজাস্টারের সঙ্গে। ব্রিজ ও তারগহনের উপরিভাগে সমান দূরত্ব রেখে চারটি দাগ কাটা থাকে। তারগুলো বসানো হয় ঐ দাগের ওপর। খোলের উপরের অংশে ব্রিজের দুই পাশে ইংরেজি অক্ষর এস এর মতো দুইটি গর্ত থাকে। এই গর্ত দুইটিকে বলা হয় সাউন্ডহোল। ব্রিজের নিচে খোলের অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি একটি সরু খুঁটি বসানো থাকে। এই খুঁটিটিকে বলা হয় 'সাউন্ডপোস্ট। চিনরেস্টটি আবদ্ধ থাকে খোলের শেষ প্রান্তে বাঁ পাশে। এই চিনরেস্টের ওপর চিবুক রেখে ছড়ির সাহায্যে বেহালা বাজানো হয়।

ছড়িটি কাঠের তৈরি। এর দৈর্ঘ্য সোয়া দুই থেকে আড়াই ফুট। ইংরেজিতে ছড়িকে স্টিক' (Stick) বা বো (Bow) বলা হয়। ছড়িতে একগুচ্ছ সাদা ঘোড়ার লেজের চুল লাগানো থাকে। বাজাবার আগে চুলগুলোতে রজন লাগিয়ে নিতে হয়। রজন বিহীন চুল দিয়ে তারে ঘর্ষণ করলে কোনো শব্দ হয় না। ছড়ির গোড়ায় একটি স্ক্রু আঁটা থাকে। এই স্ক্রুর সাহায্যে ছড়ির চুলগুলোকে ইচ্ছানুযায়ী ঢিলে ও টান করা যায়।

ইংরেজিতে বেহালার প্রথম তারটিকে 'ই', দ্বিতীয়টিকে 'এ', তৃতীয়টিকে 'ডি' এবং চতুর্থটিকে 'জি' বলা হয়। আমাদের দেশে দুইরকম পদ্ধতিতে বেহালার সুর মিলাবার নিয়ম প্রচলিত। কেউ কেউ তৃতীয় তারটিকে আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় তারটিকে 'ষড়জ বা সা' এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকেন।

যদি তৃতীয় তারটিকে 'সা' বলে ধরা হয় তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তারটির সুর মিলাতে হবে যথাক্রমে তার সপ্তকের ঋষভ, মুদারা সপ্তকের পঞ্চম, মুদারা সপ্তকের ষড়জ ও উদারা সপ্তকের মধ্যমের সঙ্গে। আর যদি দ্বিতীয় তারটিকে 'সা' বলে ধরা হয় তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তারটির সুর মিলাতে হয় যথাক্রমে মুদারা সপ্তকের পঞ্চম, মুদারা সপ্তকের ষড়জ, উদারা সপ্তকের মধ্যম ও অতি উদারা সপ্তকের কোমল নিষাদের সঙ্গে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আগে আমাদের দেশে বেহালাতে ব্যবহৃত প্রথম তারটি ব্যতীত অন্যান্য তারগুলো ছিল গাঁটের তৈরি বর্তমানে ব্যবহৃত সবগুলো তারই ধাতুর তৈরি। তাছাড়া, ছড়িতে আজকাল ঘোড়ার লেজের চুলের পরিবর্তে নাইলনের চুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। কোলকাতায় আলাউদ্দিন খাঁ কী কী বাদ্যযন্ত্রের তালিম গ্রহণ করেন ?

২। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কীভাবে ওস্তাদ আহম্মদ আলী খাঁর সান্নিধ্যে আসেন ?

৩। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কী কী পদক ও সম্মানে ভূষিত হন?

৪। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সৃষ্ট রাগসমূহের নাম লেখ।

৫। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যগণের নাম লেখ।

৬। মিজরাব, জওয়া, মানকা, কীলক, তারগহন, তবলী, সোয়ারী, পটরী, সারিকা, বয়লা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। পারস্য ভাষায় সেতার যন্ত্রের অর্থ বর্ণনা কর। সেতার গোত্রের দুইটি বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখ।

৮। সেতার কত প্রকার ও কী কী? প্রতিটিতে কয়টি তার থাকে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাচীনযুগে সংগীতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাগসংগীতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। মধ্যযুগের রাগসংগীতের চর্চা ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। সংগীতে নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরার অবদান আলোচনা কর।

৫। শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চায় মোঘল যুগের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। সংগীতের বিকাশ ও উন্নয়নে রাজদরবারকেন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ দাও।

৭। নিচের গ্রন্থ'গুলোর রচয়িতার নাম উল্লেখ কর:-

'সংগীত রত্নাকর', 'মানকুতুহল', 'রাগ তরঙ্গিণী', 'অনুপসংগীত রত্নাকর', 'সংগীত দর্পণ', 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা', 'বৃহদ্দেশী'।

৮। শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনী লেখ।

১০। সংগীতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর অবদান মূল্যায়ন কর।

১১। বাউল কবি লালন শাহের আত্মজীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১২। লালন শাহের গানকে কতভাগে ভাগ করা যায়? সংক্ষেপে লেখ।

১৩। লালন শাহের বিখ্যাত গানগুলোর ভাব অবলম্বনে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

১৪। মোমতাজ আলী খানের জীবনী আলোচনা কর।

১৫। রবীন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষা সম্পর্কে কী জানো?

১৬। রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের পারিবারিক পটভূমি আলোচনা কর।

১৭। রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গান সম্পর্কে লেখ।

১৮। 'বাংলা নাগরিক সংগীতের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান'– আলোচনা কর।

১৯। রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি বছরে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দাও।

২০। রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত কর।

২১। কাজী নজরুলের জীবনী আলোচনা কর।

২২। কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা জীবনের পুর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও।

২৩। নজরুলের সম্পাদনায় কী কী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল? এ বিষয়ে লেখ।

২৪। লোকসংগীত কী? সংক্ষেপে লোকসংগীত সম্পর্কে যা জানো লেখ।

২৫। ভাটিয়ালি গানের বর্ণনা দাও।

২৬। জারিগান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২৭। সারিগানের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

২৮। বারোমাসি গান কী?

২৯। কবিগান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩০। বাউলগানের বিবরণ দাও।

৩১। টীকা লিখ: বিয়েরগান, মুর্শিদিগান, মারফতি, মাইজভাণ্ডারী, গাজীরগান, চটকা, টুসু, ভাদু, ভাওয়াইয়া,

৩২। পাঁচালী, গম্ভীরা, ঝুমুরগান

সাধক রাধারমণ দত্তের জীবনী ও তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩৩। আবদুল লতিফের জীবনী ও গণসংগীতে তাঁর অবদান লেখ।

৩৪। আব্দুল আলীমের জীবনী লেখ।

৩৫। স্বামী হরিদাস সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৩৬। বাংলাদেশের রাগসংগীতে বারীণ মজুমদারের অবদান আলোচনা কর।

৩৭। সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক কে? সেতার কোন গোত্রের যন্ত্র? সেতারের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা কর।

৩৮। সরোদের নাম কোন শব্দটি থেকে আহরণ করা হয়েছে? আধুনিক সরোদ বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ কৌশল লেখ।

৩৯। বেহালা বাদ্যযন্ত্রটির নির্মাণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৪০। সারেঙ্গীর বর্ণনা দাও।

৪১। পাখওয়াজের সচিত্র নির্মাণ পদ্ধতি লেখ।

৪২। খমকের সচিত্র বর্ণনা দাও।

৪৩। সারিন্দার সচিত্র পরিচিতি লিখ।

তৃতীয় অধ্যায়

শাস্ত্রীয়সংগীত

ব্যাবহারিক

স্বরলিপি পদ্ধতি

ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি

১। শুদ্ধ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি

২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে—ড্যাশ বা আড়া চিহ্ন ব্যবহার হয় এবং তীব্র স্বর লেখার জন্য স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন—$\underline{\text{রে}}$ $\underline{\text{গ}}$ $\underline{\text{ধ}}$ $\underline{\text{নি}}$ এবং $\overset{|}{\text{ম}}$

৩। উদারা বা মন্দ্র সপ্তকের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন—$\underset{\cdot}{\text{নি}}$ $\underset{\cdot}{\text{ধ}}$ $\underset{\cdot}{\text{প}}$ $\underset{\cdot}{\text{ম}}$

৪। তার সপ্তকের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন—$\dot{\text{সা}}$ $\dot{\text{রে}}$ $\dot{\text{গ}}$ $\dot{\text{ম}}$

৫। স্বর দীর্ঘ হলে স্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন—সা - - রে গ প - - ম ।

৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবগ্রহ বা এস (ऽ) চিহ্ন বলে, যেমন—ধ ন ऽ । ধা ন্ ন । পূ ষ পে । ভ রা ऽ ।

৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন—নি রে$^{\text{গ}}$ গ, গ$^{\text{ম}}$ প -$^{\text{গ}}$রে গ - ।

৮। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্দ্র বসে যেমন— $\overparen{\text{প গ}}$ $\overparen{\text{সা}\ \underset{\cdot}{\text{ধ}}}$ ।

৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—মা ধু রী । ক রে ছো। দাऽ ন, আ মা র

১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন—একমাত্রায় চার স্বর পধমপ = (প) সারে$\underset{\cdot}{\text{নি}}$সা (সা)

১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের স্থানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন—

গমক

সা সা $\underset{\cdot}{\text{নি}}$ - $\underset{\cdot}{\text{ধ}}$

নি ऽ ত ऽ ऽ

খটকা

নি $^{\text{রে}}$গ $\overset{|}{\text{ম}}$ প

নি ত উ ঠ

১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়, যেমন—$\underparen{\text{গমপ}}$ সা $\underparen{\text{ধপ}}$ $\underparen{\text{গমগ}}$ $\underparen{\text{পমগরে}}$ $\underparen{\text{সা-রেগ}}$

১৩। অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন—$\underparen{\text{সা, ধ,}}$ $\underparen{\text{গম,প}}$

১৪। তালচিহ্ন স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহ্নসমূহ

সম এর গুণ চিহ্ন-	×
খালির শুন্য চিহ্ন-	০
খণ্ডের সংখ্যা-	২,৩,৪
খণ্ডের দাড়ি চিহ্ন	। ।

যেমন— সাঁ - ধ প । ম গ ম রে ।
আ ঽ মা রো জী ঽ ব নে
× ০

১৫। তাললিপি—ত্রিতাল ১৬ মাত্রা

মাত্রা সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১
বোল বা ঠেকা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তা	ধিন	ধিন	ধা	ধা
তাল চিহ্ন	×				২				০				৩				×

আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। স র গ ম প ধ ন– সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা—প্, ধ্, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ, যথা– র্স, র্র, র্গ।

২। কোমল র=ঋ, কোমল গ=জ্ঞ, কড়ি ম=হ্ম, কোমল ধ=দ এবং কোমল ন=ণ ।

৩। ঋ১ = অতিকোমল ঋষভ। অতিকোমল ঋষভের স্থান স ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ১ ,দ১, ণ১= যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। ঋ২= অনুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ২, দ২, ণ২ = যথাক্রমে অনুকোমল গান্দার, ধৈবত ও নিষাদ।

৪। একমাত্রা= া, অর্ধমাত্রা = ঃ , সিকিমাত্রা= ৹ , দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা– সরা। চারটি সিকিমাত্রা; যথা– সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা; যথা – সরঃ, একটি সিকিমাত্রা; যথা—স৹। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া এক মাত্রা; যথা–সঃগরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা— রাঃগঃ ।

৫। কোনো আসল স্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা– গরা গরা। আসল স্বরের পরে যদি কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা- রাগ।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি। সমে ও সম্ হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে I এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে। যথা– II II

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে (০) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে (১́) তাহাতেই সম্ বুঝিতে হইবে।

৯। আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব-শেষে II II দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। আস্থায়ীর আরম্ভে, II এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু "" এরূপ উদ্ধৃতি— চিহ্নের মধ্যে পুন পুন লিখিত হইয়া থাকে।

১১। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা— $\overset{||}{\text{সা}}$। হয় এইখানে একেবারে থামিবে, নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই গুস্ফবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্রবন্ধনী, যথা – { সা রা (গা মা) }। মা পা।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়, যথা–{সা $\overset{[\text{রা গা}]}{\text{রা গা}}$}। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা– I [ ] I, II [ ] II, আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

১৪। কোনো একটি স্বর যখন অন্য একটি স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ মীড়– চিহ্ন থাকে, যথা– ণা -পা ।

১৫। যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলোর বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে এবং গানের পঙ্‌ক্তিতে শুন্য (০) দেওয়া হয়।

যথা– সা -া -া -া । অথবা– সা -রা -গা -মা। একই স্বর
মা ০ ০ ০   মা ০ ০ ০

একই স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন বসে: যথা–

যথা – সা -সা -রা -রা । অথবা- সা -সা -রা -রা ।
মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ন্ ।

১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে,

যথা– সা -রা -গা -মা । সা -া -া -া ।
গা ০ ০ ন্ গা ০ ০ ন্

উচ্চারণ । স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে । ে= এ এবং ে= অ্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া 'অবেলায়' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — অ বে লা য় । তেমনি 'মনে' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় — ম নে।

কণ্ঠসাধনা

আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

১।। প্রতিটি পাল্টা ত্রিতাল, একতালে ও ঝাঁপতালে তালি খালি দেখিয়ে স্বর উচ্চারণে ও আ-কার এ চূড়ান্ত লয়ে পরিবেশন করতে হবে।

সাঁ রে গ ম প ধ নি সাঁ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

২।। প্রতি স্বর থেকে প্রতিস্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ

ক) ১। সা রে
২। সা রে গ
৩। সা রে গ ম
৪। সা রে গ ম প
৫। সা রে গ ম প ধ
৬। সা রে গ ম প ধ নি
৭। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৮। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ
৯। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ) ১। সা রে
৩। সা রে গ ম
৫। সা রে গ ম প ধ
৭। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৯। সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ

ক. ১ রে সা
২ গ রে সা
৩ ম গ রে সা
৪ প ম গ রে সা
৫ ধ প ম গ রে সা
৬ নি ধ প ম গ রে সা
৭ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা
৮ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা
৯ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১ রে সা
৩ ম গ রে সা
৫ ধ প ম গ রে সা
৭ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা
৯ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

গ. ২ গ রে সা
৪ প ম গ রে সা
৬ নি ধ প ম গ রে সা
৮ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

সরল পাল্টা

৪।

ক. ১ সা রে
২ সা রে গ রে
৩ সা রে গ ম গ রে
৪ সা রে গ ম প ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১ সা রে
৩ সা রে গ ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

গ. ২ সা রে গ রে
৪ সা রে গ ম প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৫। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

ক. ১ সা রে রে
২ সা রে গ গ রে
৩ সা রে গ ম ম গ রে
৪ সা রে গ ম প প ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ ধ প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্সা নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১ সা রে রে
৩ সা রে গ ম ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্সা নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

গ. ২ সা রে গ গ রে
৪ সা রে গ ম প প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

অলঙ্কারিক পাল্টা

৩ স্বরের ৩ এর প্রকার

৬। অলঙ্কারের সুত্র

১ সা রে গ
১ ২ ৩
২ সা গ রে
১ ৩ ২

৩ রে সা গ
২ ১ ৩

৪ রে গ সা
২ ৩ ১

৫ গ সা রে
৩ ১ ২

৬ গ রে সা
৩ ২ ১

এই সূত্রে ৬টি অলঙ্কার পরিবেশন করতে হবে।

যেমন:

আরোহণ	অবরোহণ
১ সা রে গ	১ সা̇ নি ধ
২ রে গ ম	২ নি ধ প
৩ গ ম প	৩ ধ প ম
৪ ম প ধ	৪ প ম গ
৫ প ধ নি	৫ ম গ রে
৬ ধ নি সা̇	৬ গ রে সা
৭ নি সা̇ রে̇	৭ রে সা নি̣
৮ সা রে̇ গ̇	৮ সা নি̣ ধ̣

৩ স্বর এর ৪ এর প্রকার। যেকোনো চারটি অলংকার শিখতে হবে।

৭। সূত্র

সা রে গ রে = ২৪ টি অলঙ্কার হয়
১ ২ ৩ ২

আরোহণ	অবরোহণ
১ সা রে গ রে	১ সা̇ নি ধ নি
২ রে গ ম গ	২ নি ধ প ধ
৩ গ ম প ম	৩ ধ প ম প
৪ ম প ধ প	৪ প ম গ ম
৫ প ধ নি ধ	৫ ম গ রে গ
৬ ধ নি সা̇ নি	৬ গ রে সা রে
৭ নি সা̇ রে̇ সা	৭ রে সা নি̣ সা
৮ সা̇ রে̇ গ̇ রে̇	৮ সা নি̣ ধ̣ নি̣

৪ স্বর এর ৪ এর প্রকার। যেকোনো চারটি অলংকার শিখতে হবে।

৮। সূত্র

সা রে গ ম = ২৪ টি অলঙ্কার হয়
১ ২ ৩ ৪

যেমন: ক.

আরোহণ	অবরোহণ
১ সা রে গ ম	১ সা̇ নি ধ প
২ রে গ ম প	২ নি ধ প ম
৩ গ ম প ধ	৩ ধ প ম গ
৪ ম প ধ নি	৪ প ম গ রে
৫ প ধ নি সা̇	৫ ম গ রে সা
৬ ধ নি সা̇ রে̇	৬ গ রে সা নি়
৭ নি সা̇ রে̇ গ̇	৭ রে সা নি় ধ়
৮ সা̇ রে̇ গ̇ ম̇	৮ সা নি় ধ় প়

খ.

১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪
১ সা রে গ ম	১ সা নি ধ প
২ রে গ ম প	২ নি ধ প ম
৩ গ ম প ধ	৩ ধ প ম গ
৪ ম প ধ নি	৪ প ম গ রে
৫ প ধ নি সা̇	৫ ম গ রে সা
৬ ধ নি সা̇ রে̇	৬ গ রে সা নি়
৭ নি সা̇ রে̇ গ̇	৭ রে সা নি় ধ়
৮ সা̇ রে̇ গ̇ ম̇	৮ সা নি় ধ় প়

৯। অলঙ্কারিক পাল্টা

১ সা রে গ রে গ ম	ম গ রে সা
২ রে গ ম গ ম প	প ম গ রে সা
৩ গ ম প ম প ধ	ধ প ম গ রে সা
৪ ম প ধ প ধ নি	নি ধ প ম গ রে সা
৫ প ধ নি ধ নি সা̇	সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৬ ধ নি সা̇ নি সা̇ রে̇	রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৭ নি সা̇ রে̇ সা̇ রে̇ গ̇	গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৮ সা̇ রে̇ গ̇ রে̇ গ̇ ম̇	ম̇ গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

১০। দুই স্বরের এর দুই এর প্রকার

ক.
১ সা রে
২ রে গ
৩ গ ম
৪ ম প
৫ প ধ
৬ ধ নি
৭ নি সা̇
৮ সা̇ রে̇
৯ রে̇ গ̇
১০ গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

খ.
১ সা রে রে গ গ ম ম গ রে সা
২ রে গ গ ম ম প প ম গ রে সা
৩ গ ম ম প প ধ ধ প ম গ রে সা
৪ ম প প ধ ধ নি নি ধ প ম গ রে সা
৫ প ধ ধ নি নি সা̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৬ ধ নি নি সা̇ সা̇ রে̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৭ নি সা̇ সা̇ রে̇ রে̇ গ̇ গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা
৮ সা̇ রে̇ রে̇ গ̇ গ̇ ম̇ ম̇ গ̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম গ রে সা

রাগঃ বৃন্দাবনী সারং

শাস্ত্রীয় পরিচয়

খেয়াল পরিবেশনের নিয়ম

১। আলাপ 'আ' কার অথবা 'বীণকারী' শিক্ষকের নিকট উত্তমরূপে শিখে নিতে হবে।

২। বন্দিশ স্থায়ী গাইবার পর ক্রমান্বয়ে বঢ়ত শৈলীতে এক একটি স্বর সংযোগে বিস্তার করতে হয়। এই বিস্তার সাধারণত 'আ' কার অথবা 'বানী' দিয়ে করা হয়।

৩। বিস্তারে তার সপ্তকে ষড়জে ন্যাস করে অন্তরার মুখড়ার পর অন্তরার বিস্তারপূর্বক অন্তরা পরিবেশনের পর স্থায়ীতে ফিরতে হয়।

৪। লয় বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে 'সরগম', 'বোল' বা 'বোল বানাও' লয়কারি করা হয়।

৫। তান ক্রিয়া-আকার ও বোল তান করে- তেহাই দিয়ে শেষ করতে হয়।

এই সকল পাল্টা ত্রিতাল, একতাল ঝাঁপতালে তালি খালি দেখিয়ে স্বর ও 'আ' কারে চূড়ান্ত লয়ে চর্চা করতে হবে। এই সকল পাল্টা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীগণ রাগ পরিবেশনের সময় ইচ্ছানুরূপ 'তান' বানিয়ে পরিবেশন করবে।

রাগঃ বৃন্দাবনী সারং

শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	বৃন্দাবনী সারং
ঠাট	কাফী
স্বর	আরোহণে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহণে কোমল নিষাদ (নি̲), অবশিষ্ট সব শুদ্ধ স্বর।
জাতি	ঔড়ব-ঔড়ব (গান্ধার, ধৈবত বর্জিত)
ন্যাস স্বর	ঋষভ, পঞ্চম
সময়	দিবা দ্বিতীয় প্রহর
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
বাদী	ঋষভ (রে)
সম্বাদী	পঞ্চম (প)
প্রকৃতি	ঈষৎ চঞ্চল
আরোহণ	সা রে, ম প, নি সা̇
অবরোহণ	সা̇ নি প, ম রে সা
স্বরূপ বা পকড়	নি় সা রে সা, রে ম প, ম রে নি় সা রে সা

রাগঃ বৃন্দাবনী সারং এর পাল্টা

১। ক. সা রে ম প নি সা̇
সা̇ নি̲ প ম রে সা

খ. সা রে ম প নি সা̇ রে̇
সা̇ নি̲ প ম রে সা নি়

গ. সা রে ম প নি সা̇ রে̇ ম̇ রে̇
সা̇ নি̲ প ম রে সা নি় প় নি়

২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ

১ সা রে
২ সা রে ম
৩ সা রে ম প
৪ সা রে ম প নি
৫ সা রে ম প নি র্সা
৬ সা রে ম প নি র্সা র্রে
৭ সা রে ম প নি র্সা র্রে র্ম
র্ম র্রে র্গা নি প ম রে সা

৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ

১ রে সা
২ ম রে সা
৩ প ম রে সা
৪ নি প ম রে সা
৫ র্সা নি প ম রে সা
৬ র্রে র্সা নি প ম রে সা
৭ র্ম র্রে র্সা নি প ম রে সা

৪। সরল পাল্টা

১ সা রে
২ সা রে ম রে
৩ সা রে ম প ম রে
৪ সা রে ম প নি প ম রে
৫ সা রে ম প নি র্সা নি প ম রে
৬ সা রে ম প নি র্সা র্রে র্সা নি প ম রে
৭ সা রে ম প নি র্সা র্রে র্ম র্রে র্সা নি প ম রে সা

৫। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ অবরোহণ প্রকার

১ সা রে রে
২ সা রে ম ম রে
৩ সা রে ম প প ম রে
৪ সা রে ম প নি নি প ম রে
৫ সা রে ম প নি র্সা র্সা নি প ম রে
৬ সা রে ম প নি র্সা র্রে র্রে র্সা নি প ম রে
৭ সা রে ম প নি র্সা র্রে র্ম র্ম র্রে র্সা নি প ম রে সা

৬। অলঙ্কারিক পাল্টা

ক. ১ সা রে
২ রে ম
৩ ম প
৪ প নি
৫ নি সাঁ
৬ সাঁ রেঁ
৭ রেঁ মঁ
মঁ রেঁ সাঁ নি প ম রে সা

খ) ১ রে সা
২ ম রে
৩ প ম
৪ নি প
৫ সাঁ নি
৬ রেঁ সা
৭ মঁ রেঁ
মঁ রেঁ সাঁ নি প ম রে সা

৭।

ক. ১ সা রে ম
২ রে ম প
৩ ম প নি
৪ প নি সাঁ
৫ নি সাঁ রেঁ
৬ সাঁ রেঁ মঁ
৭ মঁরেঁ মঁরেঁ সাঁনি পনি পম রেম রেসা নি্সা

খ. ১ ম রে সা
২ প ম রে
৩ নি প ম
৪ সাঁ নি প
৫ রেঁ সাঁ নি্
৬ মঁ রেঁ সাঁ
৭ মঁরেঁ সাঁরেঁ সাঁনি পম পম রেসা নি্সা

৮।
সারে সারে
রেম রেম
মপ মপ
পনি পনি
নিসাঁ নিসাঁ
সাঁরেঁ সাঁরেঁ
রেঁমঁ রেঁমঁ
মঁরেঁ সাঁনি পম রেসা

রাগঃ বৃন্দাবনী সারং

ত্রিতাল–মধ্যলয়

আলাপঃ সা, নি় সা রে সা, নি় সা রে ম রে, ম ম প ম রে, ম রে নি় সা রে সা

খেয়াল

স্থায়ী

বন বন ঢুণ্ডন জাউ
কিত হু ছুপ গয়ে কৃষ্ণ মুরারী ॥

অন্তরা

শীষ মুকুট অউর কানন কুণ্ডল
বন্সী ধর মন রংগ ফিরত
গিরীধারী ॥

স্থায়ী

								সাঁ	সাঁ	সাঁরেঁ	সাঁ	নি	প	ম	প
								ব	ন	বS	ন	ঢু	ন্	ড	ন
								০				৩			
মরে	রে	পম	-	প	নি	মপ	নিসাঁ	ম	প	সাঁ	-	নি	প	ম	রে
জা	S	SS	S	উ	SS	SS	SS	কি	ত	হু	S	ছু	প	গ	য়ে
×				২				০				৩			
মরে	ম	পনি	প	মরে	রে	সা	-								
কৃS	ষ	নS	মু	রাS	S	রী	S								
×				২											

অন্তরা

								ম	-	প	প	নি	প	নিনি	নি
								শী	S	ষ	মু	কু	ট	অউ	র
								×				২			
সাঁ	-	সাঁ	গাঁ	রে	সাঁনি	সা	সাঁ	নি	সাঁ	রেঁ	মঁ	মঁরেঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ
কা	S	ন	ন	কু	নS	ড	ল	ব	ন্	সী	S	ধS	র	ম	ন
০				৩				×				২			
নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	নি	প	প	মপ	নিসাঁ	রেঁমঁ	রেঁসাঁ	নিসাঁ	রেঁসাঁ	নি	প
র	ং	গ	ফি	র	ত	গি	রী	ধাS	SS	SS	SS	SS	SS	রী	S
০				২				×							

খেয়াল

স্থায়ী

ত্রিতাল–মধ্যলয়

বোলন লাগি পাপিয়া
বিনতি করত অব মানত নহি ॥

অন্তরা

নিসদিন ছটফট করত রহত হ্যায়
পবন সনন সম উরত ধাবত হ্যায়
কাছুন করত দেত ধীরজন দেত ॥

স্থায়ী

								সাঁ	-	নি̲	প	ম	-	রে	সা
								বো	ঽ	ল	ন	লা	ঽ	গী	রে
								০				৩			
ম	রে	ম	প	সাঁ	-	নিসাঁ	-	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি̲	নি̲	প	প
পা	ঽ	পি	ঽ	য়া	ঽ	ঽঽ	ঽ	বি	ন	তি	ক	র	ত	অ	ত
×				২				০				৩			
ম	রে	প	ম	রে	-	সা	-								
মা	ঽ	ন	ত	ন	ঽ	হী	ঽ								

অন্তরা

								ম	ম	প	প	নি̲	প	নি	নি
								নি	স	দি	ন	ছ	ট	ফ	ট
নি	সাঁ	সা	রেঁ	নি	নি	সাঁ	সাঁ	নি	সাঁ	রেঁ	মঁ	রেঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ
ক	র	ত	র	হ	ত	হ্যা	য়	প	ব	ন	স	ন	ন	স	ম
×				২				০				৩			

নি	র্সা	র্রে	র্সা	নি	নি	প	প	ম	রে	প	ম	নি	প	নি	র্সা
উ	ড়	ত	ধা	ব	ত	হ্যা	য়	কা	ছু	না	ক	র	ত	দে	ত
×				২				০				৩			
(সা) ऽ	নি	প		ম	রে	সা	-								
ধী	র	জ	ন	দে	ऽ	ত	ऽ								
×				২											

বিস্তার ১। সা নি্ সা রে নি্ সা, রে সা নি্ প্ মা প্ নি্ নি্ সা, সা রে সা
২। নি্ সা রে ম রে, ম রে নি্ সা রে সা
৩। নি্ সা রে ম প ম রে, রে প ম প ম রে, ম রে নি্ সা রে সা
৪। নি্ সা রে ম রে ম প, ম প ম প ম রে, রে ম ম প ম রে, নি্ সা রে ম রে,
নি্ সা রে সা
৫। ম ম প নি প ম রে, ম প নি র্সা নি প, ম রে নি্ সা রে, সা
৬। ম ম প নি প নি নি র্সা র্সা র্রে নি র্সা র্রে র্সা
৭। নি র্সা র্রে র্ম র্রে র্সা, নি নি র্সা
৮। র্সা নি প ম প নি প ম রে রে ম রে, সা নি্ সা রে সা ॥

৮ মাত্রার তান
সোম থেকে শুরু

১। সারে মপ নির্সা র্রের্রে | র্সানি পম রেসা নির্সা | বোলন
২। সারে মরে মপ নিপ | নির্সা নিপ মরে সা | বোলন
৩। মম রেম পপ মপ | র্সানি পম রেসা নির্সা | বোলন
৪। মপ পম পনি নিপ | নির্সা নিপ মরে সা | বোলন

১২ মাত্রার তান
১৩ মাত্রা থেকে শুরু হবে–

৫। সারে মপ মরে মপ | নিপ মরে মপ নির্সা | নিপ মরে সানি্ সা | বোলন
৬। নিনি পম রেম পনি | পপ মরে মপ নির্সা | র্রের্সা নিপ মরে সা | বোলন

১৬ মাত্রার তান
খালি থেকে শুরু হবে–

৭। সারে মপ নির্সা র্রের্ম | র্রের্সা নিপ মরে সারে | মপ নির্সা নিপ মরে | সারে মপ মরে সা | বোলন
৮। মপ পপ পনি নিনি | র্সার্রে র্সার্রে র্রের্ম র্রের্ম | র্মর্ম র্রের্সা নির্সা র্রের্সা | নিনি পম রেসা নিসা | বোলন

রাগ: ভীমপলশ্রী

শাস্ত্রীয় পরিচয়

ঠাট	কাফী
স্বর	গান্ধার, নিষাদ কোমল (গ̲, নি̲) অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
জাতি	ঔড়ব-সম্পূর্ণ
আরোহে	ঋষভ-ধৈবত বর্জিত
ন্যাস স্বর	ষড়জ, মধ্যম
বাদী	মধ্যম
সম্বাদী	ষড়জ
সময়	দিবা চতুর্থ প্রহর
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	শান্ত ও করুণ রসাত্মক
আরোহণ	নি̲̣ সা গ̲ ম, প নি̲ সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি̲ ধ প ম গ̲ রে সা
স্বরূপ বা পকড়	নি̲̣ সা গ̲ ম, প গ̲ ম, ম গ̲ রে সা

ভীমপলশ্রীর পাল্টা

১। ক) নি̲̣ সা গ̲ ম প নি̲ সাঁ
সাঁ নি̲ ধ প ম গ̲ রে সা

খ) নি̲̣ সা গ̲ ম প নি̲ সাঁ গ̲ঁ রেঁ
সাঁ নি̲ ধ প ম গ̲ রে সা নি̲̣

গ) নি̲̣ সা গ ম প নি̲ সাঁ গ̲ঁ মঁ গ̲ঁ রেঁ
সাঁ নি̲ ধ প ম গ̲ রে সা নি̲̣ ধ̣ প̣ নি̲̣

২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ

১ নি̲̣ সা
২ নি̲̣ সা গ̲
৩ নি̲̣ সা গ̲ ম
৪ নি̲̣ সা গ̲ ম প
৫ নি̲̣ সা গ̲ ম প নি̲
৬ নি̲̣ সা গ̲ ম প নি সাঁ
৭ নি̲̣ সা গ̲ ম প নি̲ সাঁ গ̲ঁ
গ̲ঁ রেঁ সাঁ নি̲ ধ প ম গ̲ রে সা

৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ–

১ গ রে সা
২ ম গ রে সা
৩ প ম গ রে সা
৪ ধ প ম গ রে সা
৫ নি ধ প ম গ রে সা
৬ র্সা নি ধ প ম গ রে সা
৭ র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৪। সরল পাল্টা

১ নি সা
২ নি সা গ রে সা
৩ নি সা গ ম গ রে সা
৪ নি সা গ ম প ম গ রে সা
৫ নি সা গ ম প প ম গ রে সা
৬ নি সা গ ম প নি ধ প ম গ রে সা
৭ নি সা গ ম প নি র্সা নি ধ প ম গ রে সা
৮ নি সা গ ম প নি র্সা র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা
৯ নি সা গ ম প নি র্সা র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা
১০ নি সা গ ম প নি র্সা র্গ র্ম র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

৫। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

১ নি সা সা
২ নি সা গ গ রে
৩ নি সা গ ম ম গ রে
৪ নি সা গ ম প প ম গ রে
৫ নি সা গ ম প নি নি ধ প ম গ রে
৬ নি সা গ ম প নি র্সা র্সা নি ধ প ম গ রে
৭ নি সা গ ম প নি র্সা র্গ র্গ সা নি ধ প ম গ রে
৮ নি সা গ ম প নি র্সা র্গ র্ম র্ম র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

অলঙ্কারিক পাল্টা ২ স্বর এর ২ এর প্রকার

৬।

ক. ১ নি সা
২ সা গ
৩ গ ম
৪ ম প
৫ প নি
৬ নি সাঁ
৭ সাঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১ রে সা
২ ম গ
৩ প ম
৪ নি প
৫ সাঁ নি
৬ রেঁ সাঁ
৭ মঁ গঁ
মঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৭। ৩ স্বর এর ৩ এর প্রকার

ক. ১ নি সা গ
২ সা গ ম
৩ গ ম প
৪ ম প নি
৫ প নি সাঁ
৬ নি সাঁ গঁ
৭ সাঁ গঁ মঁ
মঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১. গ রে সা
২. প ম গ
৩. ধ প ম
৪. নি ধ প
৫. সাঁ নি প
৬. রেঁ সাঁ নি
৭. গঁ রেঁ সাঁ
মঁ গঁ রে সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৮। নি়সা নি়সা
সাগ সাগ
গম গম
মপ মপ
পনি পনি
নিসাঁ নিসাঁ
সাঁগঁ সাঁগঁ
গঁমঁ গঁমঁ
মঁ গঁ রেঁ সাঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প নি ধ প ম গ রে সা গ রে সা নি় সা

রাগ: ভীমপলশ্রী

খেয়াল

ত্রিতাল–মধ্যলয়

স্থায়ী

যা যারে আপন মন্দর বা
সুন পাওয়েগী সাস ননদীয়া ॥

অন্তরা

সুন হো সদারঙ্গ তুমকো চাহত হ্যায়
কেয়া তুম হামকো সগুন দিয়া ॥

স্থায়ী

						প	–	মগ	–	রে	সা	রে	নি	সা	–
						যা	ঽ	য়াঽ	ঽ	রে	ঽ	আ	প	ন	ঽ
								০				৩			
ম	ম	ম	ম	ম	গ	ম	প	প	নি	র্সা	র্গ	র্রে	-	র্সা	-
ম	ন্	দ	র	বা	ঽ	সু	ন	পা	ও	য়ে	ঽ	গী	ঽ	সা	ঽ
×				২				০				৩			
র্রে	র্সা	নি	ধ	পম	গম	প	-								
স	ন	ন	দী	য়াঽ	ঽঽ	যা	ঽ								
×				২											

অন্তরা

								প	প	প	প	পম	প	গ	ম
								সু	ন	হো	স	দাঽ	ঽ	রং	গ
								০				৩			
প	পপ	নি	নি	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	প	নি	র্সা	র্গ	র্রে	র্রে	সা	–
তু	মঽ	কো	চা	হ	ত	হ্যা	য়	কে	য়া	তু	ম	হা	ম	কো	ঽ
×				২				০				৩			
র্সা	নি	ধ	প	পম	গম	প	-								
স	গু	ন	দি	য়াঽ	ঽঽ	ঽ	যা								
×				২											

রাগ: ভীমপলশ্রী

খেয়াল ঝাঁপতাল-মধ্যলয়

স্থায়ী

আরজ সুন মোরী ব্রীজকে বসাইয়া
পার কর মোপে জীবন নৈয়া ॥

অন্তরা

তুম হো জগকে একহী খেবৈয়া
পার কর মোপে জীবন নৈয়া ॥

স্থায়ী

নি	সা	মগ	ম	প	গ	মগ	রে	-	সা
আ	র	জS	S	সু	ন	SS	মো	S	রী
×		২			০		৩		
গ	ম	প	–	নি	ধ	প	মপ	মগ	ম
বী	জ	কে	S	ব	সা	ই	য়াS	SS	S
×		২			০		৩		
প	–	মগ	মগ	ম	গ	–	রে	–	সা
পা	S	রS	SS	ক	র	S	মো	S	পে
×		২			০		৩		
সা	নি	ধ	-	নি	পম	নিপ	মগ	মগ	ম
জী	S	ব	S	ন	নৈS	ইS	য়া	SS	S
×		২			০		৩		

অন্তরা

পম	প	গ	–	ম	প	নি	সা	–	–
তুS	ম	হো	S	S	জ	গ	কে	S	S
নি	নি	সা	–	গ	রে	সা	নি	ধ	প
এ	ক	হী	S	খে	ব	ই	য়া	S	S

প	–	মগ	মগ	ম	গ	–	রে	–	সা
পা	S	রS	SS	ক	র	S	মো	S	পে
র্সা	নি	ধ	-	নি	পম	নিপ	মগ	মগ	ম
জী	S	ব	S	ন	নৈS	ইS	য়া	SS	S

বিস্তার

১। সা, নি় নি় সা, রে সা নি় সা, নি় ধ় প় ম় প় নি় নি় নি় সা
২। নি় সা গ রে সা, প় নি় সা গ রে সা
৩। নি় সা গ ম, গ ম সা গা ম, প গ ম, ম গ রে সা
৪। সা গ ম প গ ম, ম গ প ম প গ ম, ম গ রে সা
৫। সা ম প নি ধ প ম, প গ ম প র্সা নি ধ প, প ধ ম প গ ম, ম গ রে সা
৬। ম প গ ম প নি নি ধ প ম, প নি নি র্সা
৭। প নি র্সা র্গ র্রে র্সা, র্সা র্গ র্ম র্গ র্রে র্সা, র্রে র্সা নি র্সা, নি ধ প ম প গ ম, সা গ ম
প গ রে সা

রাগঃ ভুপালী

শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	ভুপালী
ঠাট	কল্যাণ
স্বর	মধ্যম (ম) নিষাদ (নি) বর্জিত অবশিষ্ট স্বর সমূহ শুদ্ধ
জাতি	ঔড়ব-ঔড়ব
বাদী	গান্ধার
সম্বাদী	ধৈবত
ন্যাস স্বর	গান্ধার, ধৈবত, পঞ্চম
সময়	রাত্রি প্রথম প্রহর
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	শান্ত
আরোহণ	সা রে গ, প, ধ র্সা
অবরোহণ	র্সা ধ, প, গ, রে সা
স্বরূপ বা পকড়	গ রে গ, প, রে গ, গ রে সা, ধ্ প্ ধ্ সা

পাল্টা

১। ক) সা রে গ প ধ র্সা
র্সা ধ প গ রে সা

খ) সা রে গ প ধ র্সা র্রে
র্সা ধ প গ রে সা ধ্

গ) সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্গ
র্সা ধ প গ রে সা ধ্ প্

২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর শুধু আরোহণ

১ সা রে
২ সা রে গ
৩ সা রে গ প
৪ সা রে গ প ধ
৫ সা রে গ প ধ র্সা
৬ সা রে গ প ধ র্সা র্রে
৭ সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্গ
র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর শুধু অবরোহণ

১. রে সা
২. গ রে সা
৩. প গ রে সা
৪. ধ প গ রে সা
৫. র্সা ধ প গ রে সা
৬. র্রে র্সা ধ প গ রে সা
৭. র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

৪। সরল পাল্টা

১ সা রে
২ সা রে গ রে
৩ সা রে গ প গ রে
৪ সা রে গ প ধ প গ রে
৫ সা রে গ প ধ র্সা ধ প গ রে
৬ সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্সা ধ প গ রে
৭ সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

৫। সরল পাল্টার পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

১ সা রে রে
২ সা রে গ গ রে
৩ সা রে গ প প গ রে
৪ সা রে গ প ধ ধ প গ রে
৫ সা রে গ প ধ র্সা র্সা ধ প গ রে
৬ সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্রে সা ধ প গ রে
৭ সা রে গ প ধ র্সা র্রে র্গ র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে

৬।

ক) ১ সা রে
২ রে গ
৩ গ প
৪ প ধ
৫ ধ র্সা
৬ র্সা র্রে
৭ র্রে র্গ
র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

খ) ১ রে সা
২ গ রে
৩ প গ
৪ ধ প
৫ র্সা ধ
৬ র্রে র্সা
৭ র্গ র্রে
র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

৭।

ক. ১ সা রে গ
২ রে গ প
৩ গ প ধ
৪ প ধ র্সা
৫ ধ র্সা র্রে
৬ র্সা র্রে র্গ
র্গ র্রে র্গ র্রে র্সা ধ প ধ প গ রে গ রে সা ধ্ সা

খ. ১ গ রে সা
২ প গ রে
৩ ধ প গ
৪ র্সা ধ প
৫ র্রে র্সা ধ
৬ র্গ র্রে র্সা
র্গ র্রে র্সা র্রে র্সা ধ প ধ প গ রে সা ধ্ সা

৮।

ক. ১ সা রে সা রে
২ রে গ রে গ
৩ গ প গ প
৪ প ধ প ধ
৫ ধ র্সা ধ র্সা
৬ র্সা র্রে র্সা র্রে
৭ র্রে র্গ র্রে র্গ
র্গ র্রে র্সা ধ প গ রে সা

রাগঃ ভুপালী

আলাপঃ সা ধ্ ধ্ সা, ধ্ সা গ রে গ গ রে গ প রে গ, সা রে গ রে সা ধ্ প্ ধ্ সা

খেয়াল

ত্রিতাল—মধ্যলয়

স্থায়ী

যা যা যারে যারে পথিকবা
জায় সুনায় মোরা সন্দেসবা ॥

অন্তরা

মন আকুলাবে জিয়া ঘাবরায়ে
জায় বসে জা সুন পরদেশবা ॥

স্থায়ী

গপ	গরে	গপ	ধপ	গ	রে	সা	রে	প	—	গ	রে	গ	রে	সা	—
যাS	SS	যাS	যাS	যা	S	রে	S	যা	S	রে	প	থি	ক	বা	S
০				৩				×				২			
গা	-রে	সা	বে	সা	ধ্	সা	রে	গ	—	গ	প	রে	রে	সা	—
জা	SS	য়	সু	না	S	য়	S	মো	S	রা	সন্	দে	স	বা	S
০				৩				×				২			

অন্তরা

প	গ	প	প	সাঁ	ধ	$^{\text{সা}}$ধ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	রেঁ	–	সাঁ	–
ম	ন	আ	কু	লা	S	য়ে	S	জি	য়া	ঘা	ব	রা	S	য়ে	S
০															
সাঁ	-	ধ	ধ	সাঁ	-	রেঁ	–	সাঁ	-	$^{\text{ধ}}$প	প	রে	রে	সা	S
যা	S	য়	ব	সে	S	যা	S	সু	ন্	প	র	দে	শ	বা	S
০				৩				×				২			

বিস্তার

১। সা, ধ্ ধ্ সা সা ধ্ প্, ধ্ সা রে রে গ, গ রে সা ধ্ ধ্ সা।
২। সা রে গ, প রে গা, ধ্ সা রে সা রে গ, গ রে সা ধ্ সা।
৩। ধ্ সা রে সা রে গ প প গ, গ রে গ প প রে গ, গ প ধ্ প রে গ গ রে সা।
৪। গ রে সা রে গা প গ রে গ প, গ প গ প ধ প গ প রে গ, গ র রে সা ধ্ সা।
৫। গ রে রে প গ গ প ধ প, গ প সাঁ ধ প, গ ধ প সাঁ ধ প গ, প ধ প, গ রে গ, গ রে সা ধ্ ধ্ সা।
৬। প গ প সাঁ ধ সাঁ ধ সাঁ, সাঁ ধ সাঁ রেঁ সাঁ, ধ সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ ধ সা।
৭। সাঁ প ধ প প প গ রে গ, গ রে সা ধ্ প্ ধ্ সা।

রাগঃ ভুপালী

তারানা

ত্রিতাল–মধ্যলয়

স্থায়ী

											সা	S	ধ্	সা	রে
											দ্রী	ম্	ত	ন	ন
												৩			
গ	-	গ	-	গ	রে	গ	প	গ	রে	সা	-	প	গ	প	প
দ্রী	ম্	দ্রী	ম্	ত	ন	ন	ন	দে	রে	না	S	ত	ন	ন	ন
০				২				০				৩			
ধ	S	প	প	গ	রে	গ	প	গ	রে	সা ,	সা	S			
দ্রী	ম্	ত	ন	ত	দি	য়	ন	দে	রে	না ,	দ্রী	ম্			
×				২				০				৩			

অন্তরা

								প	গ	প	প	^{স}ধ	^{স}ধ	সাঁ	-
								উ	দ	ত	ন	দে	রে	না	S
								×				৩			
সাঁ	-	সাঁ	সাঁ	রেঁ	রেঁ	সাঁ	-	সাঁ	ধ	সাঁ	সাঁ	রেঁ	রেঁ	রেঁ	-
দ্রী	ম্	ত	ন	দে	রে	না	S	ত	দি	য়	ন	দে	রে	না	S
০				২				০				৩			
সাঁ	রেঁ	গঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ	ধ	প,	গ	রে	গ,	প	গ	প , ধ		ধ
ত	ন	ন	ন	দে	রে	না	S,	ত	ন	ন,	ত	ন	ন , ত		ন
×				২				০				৩			

সাঁসাঁ	ধসাঁ	ধপ ,	গঁরেঁ	সাঁধ	গরে	গ ,	গরে
দিরদির	দিরদির	তন্ ,	তদি	য়ন্	দেরে	ন ,	দেরে
×				২			
প ,	গরে	সা ,	সা	S			
না	দেরে	না ,	দ্রী	ম্			
০				৩			

রাগঃ কাফী

শাস্ত্রীয় পরিচয়

রাগ	কাফী
ঠাট	কাফী
স্বর	গান্ধার-নিষাদ কোমল ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ
জাতি	সম্পূর্ণ
বাদী	পঞ্চম
সম্বাদী	ষড়জ
ন্যাস স্বর	ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম
সময়	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	চঞ্চল
আরোহণ	সা, রে গ মা প, ধ নি সাঁ
অবরোহণ	সাঁ নি ধ প, ম গ রে, সা
স্বরূপ বা পকড়	সাসা রেরে গগ মম পা ধ প মপ গ রে সা

পাল্টা

১। ক. সা রে গ ম প ধ নি সা
সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ
সাঁ নি ধ প ম গ রে সা নি়

গ. সা রে গ ম প ধ নি সা রেঁ গঁ রেঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা নি় ধ় নি়

২। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ

১ সা রে
২ সা রে গ
৩ সা রে গ ম
৪ সা রে গ ম প
৫ সা রে গ ম প ধ
৬ সা রে গ ম প ধ নি
৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ
৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৩। প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ

১ রে সা

২ গ রে সা

৩ ম গ রে সা

৪ প ম গ রে সা

৫ ধ প ম গ রে সা

৬ নি ধ প ম গ রে সা

৭ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৮ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৯ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৪। সরল পাল্টা

১ সা রে

২ সা রে গ রে

৩ সা রে গ ম গ রে

৪ সা রে গ ম প ম গ রে

৫ সা রে গ ম প ধ প ম গ রে

৬ সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে

৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ রে

৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে

৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৫। সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

১ সা রে রে

২ সা রে গ গ রে

৩ সা রে গ ম ম গ রে

৪ সা রে গ ম প প ম গ রে

৫ সা রে গ ম প ধ ধ প ম গ রে

৬ সা রে গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ রে

৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে

৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ রেঁ সা নি ধ প ম গ রে

৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে, সা

৬। অলঙ্কারিক পাল্টা ২ স্বর এর ২ এর প্রকার

ক. ১ সা রে
২ রে গ
৩ গ ম
৪ ম প
৫ প ধ
৬ ধ নি
৭ নি সা
৮ সাঁ রেঁ
৯ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ. ১ রে সা
২ গ রে
৩ ম গ
৪ প ম
৫ ধ প
৬ নি ধ
৭ সাঁ নি
৮ রেঁ সাঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৩ স্বর এর ৩ এর প্রকার

৭। ক. ১ সা রে গ
২ রে গ ম
৩ গ ম প
৪ ম প ধ
৫ প ধ নি
৬ ধ নি সাঁ
৭ নি সাঁ রেঁ
৮ সাঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি সাঁ নি ধ প ধ প ম গ ম গ রে সা

খ. ১ গ রে সা
২ ম গ রে
৩ প ম গ
৪ ধ প ম
৫ নি ধ প
৬ সাঁ নি ধ
৭ রেঁ সাঁ নি
৮ গঁ রেঁ সাঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি সাঁ নি ধ প ম গ ম গ রে সা

৮। ২ স্বর এর ৪ এর প্রকার

১ সা রে সা রে
২ রে গ রে গ
৩ গ ম গ ম
৪ ম প ম প
৫ প ধ প ধ
৬ ধ নি ধ নি
৭ নি সাঁ নি সাঁ
৮ সাঁ রেঁ সাঁ রেঁ
৯ রেঁ গঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

বিস্তার

১। সা, রে গ রে, রে গ ম প গ রে, নি় নি় সা
২। সা, রে গ সা রে প, ম ম প ধ, প ধ ম গ রে, ম গ রে সা রে নি় নি় সা
৩। রে গ রে গ ম গ ম প, ম ধ নি ধ প, প নি ধ প ধ প গ রে, সা রে নি় নি় সা
৪। ম ম প ধ নি নি ধ প, ম প ধ নি সাঁ ধ সাঁ, নি ধ প, ম ম প ধ প গ রে, ম গ রে সা
৫। ম প নি নি সাঁ ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ, ধ সাঁ গঁ রেঁ নি ধ প, ম প ধ নি সাঁ নি সাঁ
৬। সাঁ, সাঁ রেঁ গঁ রেঁ রেঁ গঁ মঁ গঁ রেঁ সাঁ সাঁ নি ধ প, ম প ম প ধ নি ধ প, প ধ ধ প
ম প গ রে, রে গ ম প গ রে সা নি় সা

রাগঃ কাফী

আলাপঃ সা, রে নিসা, রে ম গ রে, রেরে গগ মম প, মপ ধপ গ রে সারে নি নি সা

খেয়াল

ত্রিতাল — মধ্যলয়

স্থায়ী

(মোসে) বতিয়া বনাও নেহি বার বার
তোসে বিনতি করত গই হার হার ॥

অন্তরা

তুমহো ক্যায়সে নিপট আনাড়ী
কাহে করত কান্‌হা হামসে রার ॥

স্থায়ী

সা	সা	রে	রে	গ	রেগ	ম	ম	প	—	প	মপ	ধ	প	গ	রে
ব	তি	য়া	ব	না	ওS	নে	হি	বা	S	র	বাS	S	র	মো	সে
০				৩				×				২			
সা	সা	রে	রে	গ	রেগ	ম	ম	প	-	প	প	-	প	প	ম
ব	তি	য়া	ব	না	ওS	নে	হি	বা	S	র	বা	S	র	তো	সে
০				৩				×				২			
প	ধ	নি	র্সা	ধ	নি	ধ	প	ধ	-	ম	মপ	ধ	প,	গ	রে
বি	ন	তি	ক	র	ত	গ	ই	হা	S	র	হাS	S	র,	মো	সে
০				৩				×				২			

অন্তরা

ম	ম	প	-	ধ	ধ	নি	ধনি	র্সা	র্সা	নি	ধ	র্সা	-	র্সা	-
তু	ম	হো	S	ক্যা	য়	সে	SS	নি	প	ট	অ	না	S	ড়ী	S
০				৩				×				২			
নির্সা	র্রের্গ	র্রে	র্সা	ধ	নি	ধ	প	ধ	-	ম	মপ	ধ	প,	গ	রে
কাS	SS	হে	ক	র	ত	কান্	হা	হা	ম	সে	রাS	S	র,	মো	সে
০				৩				×				২			

খেয়াল

ত্রিতাল–মধ্যলয়

স্থায়ী

প্রভূ তেরী দয়া হ্যায় অপার
তু অগম অগোচর অবিকল চর অচর
সকল কো তূ আধার পতি তন কো উদ্ধার ॥

অন্তরা

দীন অনাথ পতীতরু দুর্বল
মহদপরাধী শরণাগত হু
চতুর তিহার মোহে পার উতার ॥

স্থায়ী

														সা	নি়
														প্র	ভু
সা	রে	রে	গ^{ম}	–	ম	–	ম	প	–	–	ম	প	ধ	নি	র্সা
তে	রী	দ	য়া	S	হৈ	S	অ	পা	S	র	তু	অ	গ	ম	অ
০				৩				×				২			
নি	ধ	প	ম	গ^{ম}	গ	রে	রে	রে	নি	ধ	নি	প	ধ	ম	প
গো	S	চ	র	অ	বি	ক	ল	চ	র	অ	চ	র	স	ক	ল
০				৩				×				২			
ম	গ	ম	প	ম	গ	সা	নি়	সা	গ	রে	ম	গ^{ম}	রে,	রে	সানি়
কো	S	তু	আ	ধা	র্	প	তি	ত	ন	কো	উ	দ্ধা	র,	ব্রুপ্র	ভু
০				৩				×				২			

অন্তরা

ম	-	প	ধ	নি	নি	র্সা	র্সা	র্রে^{ম}	র্গ	র্রে	র্সা	র্রে	নি	র্সা	র্সা
দী	S	ন	অ	না	S	থ	S	প	তী	ত	রু	দু	র্	ব	ল
০				৩				×				২			
নি	নি	ধ	প	গ^{ম}	–	রে	–	রে	নি	ধ	নি	প	ধ	ম	প
ম	হ	দ	প	রা	S	ধী	S	শ	র	ণা	S	গ	ত	হুঁ	S
০				৩				×				২			

ম	গ	ম	প	ম	গ	সা	ন়ি	সা	গ	রে	ম	গ^{ম}	রে	সা	নি
চ	তু	র	তি	হা	র	মো	হে	পা	ঽ	র	উ	তা	র	প্র,	ভু
০				৩				×				২			

রাগঃ ভৈরবী
শাস্ত্রীয় পরিচিয়

রাগ	ভৈরবী
ঠাট	ভৈরবী
স্বর	ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত, নিষাদ কোমল
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
ন্যাস স্বর	ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম
বাদী	মধ্যম
সম্বাদী	ষড়জ
সময়	প্রাতঃকালীন, (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	করুণ রসাত্মক ও শান্ত
আরোহণ	সা রে গ ম প ধ নি র্সা
অবরোহণ	র্সা নি ধ প ম গ রে সা
পকড়	ম প গ ম রে সা, ধ় ন়ি সা গ রে সা

আলাপ: সা, ধ় ন়ি সা গ রে গ সা রে সা
নি সা গ ম ধ প
ধ ম প ম গ ম রে সা

বিস্তারঃ ১। সা, সা গ রে গ সা রে সা ।
২। গ ম ধ প, নি ধ প, ধ ম প গ ম রে সা
৩। গ ম ধ নি র্সা নি ধ প, প ধ নি র্সা ধ প ম
গ ম রে সা, ধ় ন়ি সা গ সা রে সা।
৪। গ ম ধ নি র্সা নি র্রে র্সা, ধ নি ধ র্সা
র্সা নি ধ প ম ধ নি র্সা নি র্রে সা
৫। ধ নি র্সা র্রে র্গ র্ম র্রে র্সা র্রে নি র্ধ র্সা
র্গ র্ম র্রে র্সা, র্সা নি ধ প, ম প ধ প
ম গ ম, গ রে গ, সা রে সা

পাল্টা

১। ক) সা রে গ ম প ধ নি র্সা
র্সা নি ধ প ম গ রে সা

খ) সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে
র্সা নি ধ প ম গ রে সা নি

গ) সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ
র্সা নি ধ প ম গ রে সা নি ধ নি

প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু আরোহণ

২। ১ সা রে
২ সা রে গ
৩ সা রে গ ম
৪ সা রে গ ম প
৫ সা রে গ ম প ধ
৬ সা রে গ ম প ধ নি
৭ সা রে গ ম প ধ নি র্সা
৮ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি র্সা র্রে র্গ
র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

প্রতি স্বর থেকে প্রতি স্বর পর্যন্ত শুধু অবরোহণ

৩। ১ রে সা
২ গ রে সা
৩ ম গ রে সা
৪ প ম গ রে সা
৫ ধ প ম গ রে সা
৬ নি ধ প ম গ রে সা
৭ র্সা নি ধ প ম গ রে সা
৮ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা
৯ র্গ র্রে র্সা নি ধ প ম গ রে সা

সরল পাল্টা

৪। ১ সা রে
২ সা রে গ রে
৩ সা রে গ ম গ রে
৪ সা রে গ ম প ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

সরল পাল্টা পূর্ণ আরোহণ-অবরোহণ প্রকার

৫। ১ সা রে রে
২ সা রে গ গ রে
৩ সা রে গ ম ম গ রে
৪ সা রে গ ম প প ম গ রে
৫ সা রে গ ম প ধ ধ প ম গ রে
৬ সা রে গ ম প ধ নি নি ধ প ম গ রে
৭ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে
৮ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে
৯ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ রেঁ গঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

অলঙ্কারিক পাল্টা ২ স্বর এর ২ এর প্রকার

৬।	ক) ১ সা রে	খ) ১ রে সা
	২ রে গ	২ গ রে
	৩ গ ম	৩ ম গ
	৪ ম প	৪ প ম
	৫ প ধ	৫ ধ প
	৬ ধ নি	৬ নি ধ
	৭ নি সাঁ	৭ সাঁ নি
	৮ সাঁ রেঁ	৮ রেঁ সাঁ
	৯ রেঁ গঁ	৯ গঁ রেঁ
	গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা	গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৩ স্বর এর ৩ এর প্রকার

৭। ক) ১ সা রে গ
২ রে গ ম
৩ গ ম প
৪ ম প ধ
৫ প ধ নি
৬ ধ নি সাঁ
৭ নি সাঁ রেঁ
৮ সাঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

খ) ১ গ রে সা
২ ম গ রে
৩ প ম গ
৪ ধ প ম
৫ নি ধ প
৬ সাঁ নি ধ
৭ রেঁ সাঁ নি
৮ গঁ রেঁ সাঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

৮। ১ সা রে সা রে
২ রে গ রে গ
৩ গ ম গ ম
৪ ম প ম প
৫ প ধ প ধ
৬ ধ নি ধ নি
৭ নি সা নি সাঁ
৮ সাঁ রে সাঁ রেঁ
৯ রেঁ গঁ রেঁ গঁ
গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

রাগ: ভৈরবী

খেয়াল

ত্রিতাল–মধ্যলয়

স্থায়ী

জা এ তূমন গুরু চরণ শরণ
এক ভাওধর অন্তর মোঁ ঘন ॥

অন্তরা

জোই জাবত জন সদ্‌গুরু কে শরণ
বাকো হরত চতুর ভব বন্‌ধন ॥

স্থায়ী

–	ধ$^{\text{নি}}$	-	নি	সা	-	রে	সা	গ$^{\text{রে}}$	রে	গ	ম	রে	গ	রে	সা
ঽ	জা	ঽ	এ	তূ	ঽ	ম	ন	গু	রু	চ	র	ণ	শ	র	ণ
৩				×				২				০			
						ম		রে				গ			
সা	ধ	প	ধ	-	পম	রে	গ	সা	-	রে	ম	রে	গ	রে	সা
এ	ঽ	ক	ভা	ঽ	বঽ	ধ	র	অ	ন্	ত	র	মো	ঽ	ঘ	ন
৩				×				২				০			

অন্তরা

												সাঁ	নি	নি	
ধ$^{\text{নি}}$	ম	ধ	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	সাঁ	নি$^{\text{সাঁ}}$	-	সাঁ	সাঁ	রেঁ	সাঁ	ধ	প
জো	ই	জা	ঽ	ব	ত	জ	ন	স	দ্	গু	রু	কে	শ	র	ণ
৩				×				২				০			
-	প	-	প	ধ	পম	ম	ম	রে$^{\text{ম}}$	গ	সারে	ম	রে$^{\text{গ}}$	গ	রে	সা
ঽ	বা	ঽ	কো	হ	রঽ	ত	চ	তু	র	ভঽ	ব	ব	ন্	ধ	ন
৩				×				২				০			

ভৈরবী
খেয়াল

ত্রিতাল—মধ্যলয়

স্থায়ী

ক্যায়সী ইয়ে ভলাঈ রে কন্‌হাই
পানিয়াঁ ভরত মোরি, গগরি গিরাই করকে লড়াই ॥

অন্তরা

সনদ কহে এ্যায়সো ঢীঠ ভয়ো কন্‌হাই
কা করুঁ ম্যায় নহিঁ মানত কন্‌হাই করত লড়াই ॥

স্থায়ী

নিS$^{\text{সা}}$	সা	গ	ম	(প)	–	ধ	প	–	ধ	প	প	ম$^{\text{প}}$	প	ম	ধ
ক্যায়	সী	য়ে	ভ	লা	S	ই	রে	S	কন্‌	হা	ই	প	নি	য়াঁ	ভ
৩				×				২				০			
প	ম	গ$^{\text{ম}}$	রে	গ$^{\text{ম}}$	প	ধ	নি	ধ	প	গ$^{\text{ম}}$	ম	গ$^{\text{রে}}$	রে	সা	সা
র	ত	মো	রি	গ	গ	রি	গি	রা	ই	ক	র	কে	ল	ড়া	ই
৩				×				২				০			

অন্তরা

												ধ	ম	ধ	নি
												স	ন	দ	ক
												০			
র্সা	–	র্রের্রে	র্সা	র্সার্রে	র্গ	র্রে	র্গ	র্সা$^{\text{রে}}$	র্রে$^{\text{প}}$	র্সা	র্সা	প	-	প	প
হে	S	এ্যায়	সো	ঢীS	S	ঠ	ভ	য়ো	কন্‌	হা	ই	কা	S	ক	রুঁ
৩				×				২				০			
ধ	পম	গ	রে	গ	প	ধ	নি-	ধ	প	গ$^{\text{ম}}$	ম	গ$^{\text{রে}}$	রে	সা	সা
ম্যা	য়	ন	হিঁ	মা	ন	ত	কন্‌	হা	ই	ক	র	ত	ল	ড়া	ই
৩				×				২				০			

অনুশীলনী

১। ত্রিতালে একটি পাল্টা গেয়ে শোনাও।

২। খেয়াল পরিবেশনের নিয়মগুলো মুখে বলো।

৩। বৃন্দাবনী সারং রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় বলো।

৪। বৃন্দাবনী সারং রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন কর।

৫। ভীমপলশ্রী রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয়সহ একটি খেয়াল পরিবেশন কর।

৬। ভুপালী রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন কর।

৭। কাফী রাগে একটি খেয়াল গেয়ে শোনাও।

৮। ভৈরবী রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয় বলো এবং একটি খেয়াল গেয়ে শোনাও।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাগান

ব্যাবহারিক

রবীন্দ্রসংগীত

রাগঃ ইমন
তালঃ ঝম্পক
পর্যায়ঃ পূজা

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা-
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ॥
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে-
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা-
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ॥
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে-
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

	১´				২			১´				২		
II	সা	র্সা	র্সা	|	না	না	I	ধা	-া	ধা	|	পা	পা	I
	বি	প	দে		মো	রে		র	০	ক্ষা		ক	রো	
I	ধা	ধা	ধা	|	পা	ক্ষা	I	ক্ষগা	-ক্ষগা	ক্ষা	|	ধনা	-ধা	I
	এ	ন	হে		মো	র		প্রা	০র	থ		না	০	
I	ধা	ধা	পা	|	পা	রা	I	গা	গা	গা	|	রা	রা	I
	বি	প	দে		আ	মি		না	যে	ন		ক	রি	
						||								
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	I	গা	-া	গা	|	রা	রা	I
	ভ	০	০		০	য়		দুঃ	০	খ		তা	পে	
I	সা	সা	ন্‌া	|	ধ্‌া	ন্‌া	I	ক্ষগা	-া	রা	|	সা	ন্‌া	I
	ব্য	থি	ত		চি	তে		না	ই	বা		দি	লে	

I	সা	-া	রা	|	সরা	-গা	I	পা	-া	পা	|	পা	রা	I
	সা	ন্	ত্ব		না০	০		দুঃ	০	খে		যে	ন	
I	গা	গা	গা	|	রা	রা	I	সা	-া	-া	|	-া	-া	II
	ক	রি	তে		পা	রি		জ	০	০		০	য়্	
II	{পা	পা	-গা	|	পা	-ধা	I	ধা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	I
	স	হা	য়্		মো	র্		না	য	দি		জু	টে	
I	র্সা	র্গা	র্গা	|	র্রা	র্রা	I	র্সা	র্সা	না	|	ধা	পা}	I
	নি	জে	র		ব	ল		না	যে	ন		টু	টে	
I	র্গা	-া	র্গা	|	র্রা	র্রা	I	র্সা	র্সা	র্সা	|	না	না	I
	স	ঙ্	সা		রে	তে		ঘ	টি	লে		ক্ষ	তি	
I	ধা	ধা	ধা	|	পা	ক্ষা	I	মগা	-ক্ষাগা	ক্ষা	|	পনা	-ধা	I
	ল	ভি	লে		শু	ধু		ব	০ন্	চ		না	০	
I	ধা	ধা	পা	|	পা	রা	I	গা	গা	গা	|	রা	রা	I
	নি	জে	র		ম	নে		না	যে	ন		মা	নি	
	সা	-া	-া	|	-া	-া	II							
	ক্ষ	০	০		০	য়্								
II	{গা	ক্ষা	গা	|	গপা	পা	I	পা	পা	পা	|	মপা	-া	I
	আ	মা	রে		তু	মি		ক	রি	বে		ত্রা	ণ্	
I	পা	পা	পা	|	পা	ক্ষা	I	মগা	-ক্ষাগা	ক্ষা	|	পনা	-ধা	I
	এ	ন	হে		মো	র		প্রা	০র্	থ		না	০	
I	ধা	ধা	পা	|	পা	রা	I	গা	গা	গা	|	রা	রা	I
	ত	রি	তে		পা	রি		শ	ক	তি		যে	ন	
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	I	গা	গা	গা	|	রা	-া	I
	র	০	০		০	য়্		আ	মা	র		ভা	র্	
I	সা	সা	ন্া	|	ধ্া	ন্া	I	রগা	-া	রা	|	সা	ন্া	I
	লা	ঘ	ব		ক	রি		না	ই	বা		দি	লে	

I	সা	-া	রা	|	সরা	-গা	I	$^{\text{গ}}$পা	পা	পা	|	পা	রা	I
	সা	ন্	ত্ব		না০	০		ব	হি	তে		পা	রি	
I	গা	গা	গা	|	রা	রা	I	সা	-া	-া	|	-া	-া}	I
	এ	ম	নি		যে	ন		হ	০	০		০	য়্	
I	{পা	-া	গা	|	পা	ধা	I	ধা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	I
	ন	০	ম্র		শি	রে		সু	খে	র		দি	নে	
I	র্সা	র্গা	র্গা	|	র্রা	-া	I	র্সা	র্সা	না	|	ধা	পা}	I
	তো	মা	রি		মু	খ্		ল	ই	ব		চি	নে	
I	র্গা	র্গা	র্রা	|	র্রা	র্রা	I	র্সা	র্সা	র্সা	|	না	না	I
	দু	খে	র		রা	তে		নি	খি	ল		ধ	রা	
I	ধা	ধা	ধা	|	পা	ক্ষা	I	$^{\text{ম}}$গা	-ক্ষাগা	ক্ষা	|	$^{\text{স}}$না	-ধা	I
	যে	দি	ন		ক	রে		ব	০ন্	চ		না	০	
I	ধা	ধা	পা	|	পা	রা	I	গা	গা	গা	|	রা	-া	I
	তো	মা	রে		যে	ন		না	ক	রি		স	ঙ্	
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	II II							
	শ	০	০		০	য়্								

---

* ইমন রাগে ও ঝম্পক তালে রচিত ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান। গানটি গীতাঞ্জলির অন্তর্গত। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রচিত। ১৩১৪ সালের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয়। স্বরবিতান ২৫তম খণ্ডে এই গানের স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথ ৪৫ বছর বয়সে এই গান রচনা করেন।

রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়ঃ স্বদেশ
তালঃ দাদ্‌রা

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না ॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলে'ই কি রইবি থেমে-
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না ॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী-
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে-
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥

-ন্ধ্া II {প্া সা -া | সা সা -রা I গা -া গপা | পা গা -া I
তোর্ আ প ন্ জ নে ০ ছা ড়ু বে তো রে ০

I -া -া গা | রা সা -ন্া I ধ্া -সা সা | সা সা -রা I
০ ০ তা ব লে ০ ভা ব্ না ক রা ০

I সরা -গা রা | সা -া -া I -া -া -া | (-া -া ন্ধ্া)} I -া পা পা I
চ০ ল্ বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তোর ০ ও তোর্
I {পা ধা -া | র্সা না -া I ধা -া পা | ধা পা -া I
আ শা ০ ল তা ০ প ড়্ বে ছিঁ ড়ে ০

I মপা -া মা | গা রা -গরা I সা -রা রা | (গা পা পা)} I গা -া -া I
হ য় তো রে ফ ০ল্ ফ ল্ বে না ও তোর্ না ০ ০

I $^{\text{গ}}$ধা -া পা | পা রা -$^{\text{গ}}$রা I সা -রা রা | সরগা -া -া I
হ য়্ তো রে ফ ০ল্ ফ ল্ বে না০০ ০ ০

I -া -া পা | রা সা -ন্া I ধ্া -সা সা | সা সা -রা I
০ ০ তা ব লে ০ ভা ব্ না ক রা ০

I সরা -গা রা | সা -া -া I -া -া -া | -া -া -ন্ধ্া II
চ০ ল্ বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "তোর্"

II {গা -া গা | পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
আ স বে প থে ০ আ০ ধা র্ নে মে ০

I $^{\text{ন}}$র্সা -া না | ধা -া ধা I পধা -না না | (ধা পা -ক্ষা)] I ধা পা -া I
তা ই ব লে ই কি র০ ই বি থে মে ০ থে মে ০

I -া -া -া | -া পা পা I {পা ধা -া | র্সা না -া I
০ ০ ০ ০ ও তুই বা রে ০ বা রে ০

I ধা -া পা | $^{\text{প}}$ধা পা -া I $^{\text{ম}}$পা -া মা | গা রা -গা I
জ্বা ল্ বি বা তি ০ হ য়্ তো বা তি ০

I সা -া রা | (গা গা গা) I $^{\text{ম}}$গা -া -া | $^{\text{গ}}$ধা -া পা | গা র্া গরা I
জ ল্ বে না ও তুই না ০ ০ হ য়্ তো বা তি ০০

I সা -া রা | সরগা -া -া I -া -া গা | রা সা -ন্া I
জ্ব ল্ বে না০০ ০ ০ ০ ০ তা ব লে ০

I ধ্া -সা সা | সা সা -রা I সরা -গা রা | সা -া -া I
ভা ব্ না ক রা ০ চ০ ল্ বে না ০ ০

I -া -া -া | -া -া ন্ধ্া II
০ ০ ০ ০ ০ "তোর"

II {ধ্া -ধা সা | সা সা -রা I রা গা -া | গা গা -া I
শু নে ০ তো মা র মু খে র্ বা ণী ০

I রা -া গা | রা সা -া I সা সরা -গা | (রা সা -ন্া)} I রা সা -া I
আ স্ বে ঘি রে ০ ব নে০ র্ প্রা ণী ০ প্রা ণী ০

I {গা -পা পা | পা পা -া I ক্ষা পা -ধনা | ধা পা -ক্ষপা I
হ য়্ তো তো মা র্ আ প ০ন্ ঘ রে ০০

I গা গা -মা | গা রা -গা I সা -া রা | সরা -গা -া} I
পা ষা ণ্ হি য়া ০ গ ল্ বে না০ ০০ ০

I [গা -া গা | পা পা -ধা I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
ব দ্ ধ দু য়া র্ দে খ্ লি ব লে ০

I নর্সা -া র্না | ধা ধা -া I পধা -না না | (ধা পা -ক্ষা)} I ধা পা -া I
অ০ ম্ নি কি তু ই আ০ স্ বি চ লে ০ চ লে ০

I -া -া -া | -া {পা পা I পা ধা -া | র্সা না -া I
০ ০ ০ ০ তো রে বা রে ০ বা রে ০

I ধা -া পা | ধা পা -া I $^{\text{ম}}$পা -া মা | গা রা -গরা I
ঠে ল্ তে হ বে ০ হ য়্ তো দু য়া ০র্

I সা -া রা | গা} -া -া I গধা -া পা | গা রা -গরা I
ট ল্ বে না ০ ০ হ য় তো দু য়া ০র্

I সা -া রা | সরগা -া -া I -া -া গা | রা সা -ন্া I
ট ল্ বে না০০ ০ ০ ০ ০ তা ব লে ০

I ধ্া -সা সা | সা সা -রা I সরা -গা রা সা | -া -া I
ভা ব্ না ক রা ০ চ০ ল্ বে না ০ ০

I -া -া -া | -া -া ন্ধ্া II II
০ ০ ০ ০ ০ "তোর"

* দেশাত্মবোধক গান। স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্গত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন। বাউল ঢঙের রচনা। ভাণ্ডার' পত্রিকায় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি আছে।

রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়ঃ পূজা
তালঃ তেওড়া

জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ॥
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে ॥
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা র্সা র্সা | না -া | ধা -া I পা পা -া | ক্ষা -া | গা -া I
জ গ ত জু ০ ড়ে ০ উ দা র্ সু ০ রে ০

||
I গা ক্ষা -া | না -া | ধা -পা I রা -গা -গরা | সা -া | -া -া I
আ ন ন্ দ ০ গা ন্ বা ০ ০০ জে ০ ০ ০

I সা সা -া | সা -া | সা -া I ন্া ধ্া -ন্া | ধ্া -া | প্া -া I
সে গা ন্ ক ০ বে ০ গ ভী র্ র ০ বে ০

I সা সা সা | রা -গা | রা -পা I পা শমা -া | গা -া | -া -া II
বা জি বে হি ০ য়া ০ মা ০ ০ ঝে ০ ০ ০

II {গা গা গা | পা -াশ | ধা -াশ I র্সা র্সা র্সা | র্সা -না | র্রর্সা -র্সা I
বা তা স জ ০ ল ০ আ কা শ আ ০ লো ০

I পা পা পা | পা -ক্ষা | পা -া I না না ধা | পা -ক্ষা | গা -া} I
স বা রে ক ০ বে ০ বা সি ব ভা ০ লো ০

I{সা রা গা | গা -া | গা -মা I গরাগা মা | মা -া | মা -গা I
হৃ দ য় স ০ ভা ০ জু০ ড়ি য়া তা ০ রা ০

[-া]
I রা গা রা | পা -া | মা -গা I রা -গা -গরা | সা -া | -া -রা} II
ব সি বে না ০ না ০ সা ০ ০০ জে ০ ০ ০

II {পা পা পা | পা -া | পা -া I হ্মা পা ধা | পা -হ্মা | গা -া I
ন য় ন দু ০ টি ০ মে লি লে ক ০ বে ০

I গা হ্মা না | ধা -া | পা -হ্মা I গা -া -মা | গা -া | -া -া I
প রা ন হ ০ বে ০ খু ০ ০ শি ০ ০ ০

I গা গা রা | সা -া | সা -া I ন্া ধ্া ন্া | ধ্া -া | প্া -া I
যে প থ দি ০ য়া ০ চ লি য়া যা ০ ব ০

I সা সা সা | রা -া | রা -গা I রা -গা -মা | গা -া | -া -া} I
স বা রে যা ০ ব ০ তু ০ ০ ষি ০ ০ ০

I {গা গা গা | পা -া^{ধ} | ধা -া^{প} I র্সা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I
র য়ে ছ তু ০ মি ০ এ ক থা ক ০ বে ০

I পা পা পা | পা -হ্মা | পা -া I না না ধা | পা -হ্মা | গা -া} I
জী ব ন মা ০ ঝে ০ স হ জ হ ০ বে ০

I {সা রা গা | গা -া | গা -মা I গরা গা মা | মা -া | -া -গা I
আ প নি ক ০ বে ০ তো০ মা রি না ০ ০ ম্

[-া]
I রা গা রা | পা -া | মা -গা I রা -গা -গরা | সা -া | -া -রা} II II
ধ্ব নি বে স ০ ব ০ কা ০ ০০ জে ০ ০ ০

* মিশ্র ইমন রাগে ও তেওড়া তালে রচিত ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনে রচিত। ১৩১৬ সালের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয়। স্বরবিতান ৩৭তম খণ্ডে এ গানের স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথ ৪৮ বছর বয়সে এ গানটি রচনা করেন।

রবীন্দ্রসংগীত

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে   জোয়ার-ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,   ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

	[ধা	পা]													॥	
II	সা	সা	-া	|	সা	-া	-া	I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	কা	শ্		ভ	০	০		রা	০	০		০	০	০	
I	সা	-া	সা	|	সা	-ন্া	-রা	I	রা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	সূ	র্	য		তা	০	০		রা	০	০		০	০	০	
I	রা	-মা	মা	|	মা	মা	-গা	I	পমা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	বি	শ্	শ		ভ	রা	০		প্রা০	০	০		০	০	ণ্	
I	রমা	মা	-া	|	মা	মা	-া	I	মা	-া	-া	|	-গা	-া	-পা	I
	তা০	হা	০		রি	মা	ঝ্		খা	০	০		০	০	০	
I	$^{\text{প}}$মা	-া	-া	|	মা	মা	-গা	I	রা	রপা	-ঋা	|	$^{\text{প}}$পা	-া	-া	I
	নে	০	০		আ	মি	০		পে	য়ে০	০		ছি	০	০	

I পা পা -া | মপা পা -া I পক্ষা পা -া | ধা -া -ণা I
আ মি ০ পে০ য়ে ০ ছি০ মো র্ স্থা ০ ন্

I ধা -া সা | রা -া -া I রগা -া -া | মা -পা -ধপাI
বি ০ স্ম য়ে ০ ০ তা০ ০ ই জা ০ ০০

I ^{প}মা -া -া | -গা -মা -রা I রা রা -পা | ক্ষা পা -া I
গে ০ ০ ০ ০ ০ জা গে ০ আ মা র্

I ক্ষা -পা -ধা | -না -া -া I [ ] I
গা ০ ০ ০ ০ ন্

II পা পা -া | পা -া -ক্ষা I ধা -া -া | -া -া -া I
অ সী ম্ কা ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ র্

I ধা ধা -া | ধা -া -পা I পা -না -া | -া -া -া I
যে হি ল্ লো ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I না না -া | না -ধা -া I ধা -র্সা -া | -া -া -া I
জো য়া র্ ভা ০ ০ টা ০ ০ ০ ০ য়্

I না র্সা -না | ধনা -র্সনা -ধনা I ^{ধ}পা -া -া | -া -া -া I
ভু ব ন্ দো০ ০০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I র্গা র্গা -া | র্রা র্সা -া I র্সা -না র্রর্সা | র্সা -না -ধা I
না ড়ী ০ তে মো র্ র ক্ ত০ ধা ০ ০

I পা -া -া | -রা -া -া I রা গা -রা | গা মা -গা I
রা ০ ০ ০ ০ য়্ লে গে ০ ছে তা র্

I গা -পা -া | -া -া -া I পা -া সা | র্রা -া -া I
টা ০ ০ ০ ০ ন্ বি ০ স্ম য়ে ০ ০

I রগা -া -া | মা -পা -ধপা I $^{\text{প}}$মা -া -া | -গা -মা -রা I
তা০ ০ ই জা ০ ০০ গে ০ ০ ০ ০ ০

I রা রা -পা | ক্ষা পা -া I ক্ষা -পা -ধা | -না -া -া I[ ]I
জা গে ০ আ মা র্ গা ০ ০ ০ ০ ন্

II সমা মা -া | মা মা -া I সা -মা -া | মা মা -গপা I
ঘা০ সে ০ ঘা সে ০ পা ০ ০ ফে লে ০০

I $^{\text{প}}$মা -া -া | -া -া -া I সমা মা -া | মা মা -গপা I
ছি ০ ০ ০ ০ ০ ব০ নে র্ প থে ০০

I পক্ষা পা -া | -া -া -া I ধা না -া | র্সা -না র্সর্রা I
যে০ তে ০ ০ ০ ০ ফু লে র্ গ ন্ ধে০

I র্সা র্সা -নর্সা | $^{\text{স}}$ধা পা -া I র্সা র্সা -নর্সা | $^{\text{স}}$ধা পা -ক্ষধা I
চ ম ০ক্ লে গে ০ উ ঠে ০০ ছে ম ০ন্

I $^{\text{ধ}}$পা মা -া | -া -া -া I সমা মা মা | মা মা -া I
মে তে ০ ০ ০ ০ ছ০ ড়ি য়ে আ ছে ০

I সমা মা -া | মা মগা -পা I পা -া -া | -া -া -া I
আ০ ন ন্ দে রি০ ০ দা ০ ০ ০ ০ ন্

I পা -া সা | রা -া -া I গা -া -া | গা -মা -পধা I
বি ০ স্ম য়ে ০ ০ তা ০ ই জা ০ ০০

I	পমা	-া	-া	|	-গমা	-গরা	-া	I	রা	রা	-পা	|	ক্ষা	পা	-া	I
	গে০	০	০		০০	০০	০		জা	গে	০		আ	মা	র্	
I	ধা	-া	-া	|	-ণা	-া	-া	I	ধা	-া	-পা	|	না	না	-া	I
	গা	০	০		০	০	ন্		কা	০	ন্		পে	তে	০	
I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	ধা	-না	-ধা	|	না	না	-া	I
	ছি	০	০		০	০	০		চো	০	খ্		মে	লে	০	
I	র্সা	-া	-া	|	র্সা	র্সা	-না	I	ধা	-না	-ধা	|	ধা	-র্সা	-া	I
	ছি	০	০		ধ	রা	র্		বু	০	০		কে	০	০	
I	না	-া	-া	|	না	র্সা	-র্সনা	I	ধপা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	প্রা	০	ণ্		ঢে	লে	০		ছি০	০	০		০	০	০	
I	র্গা	র্গা	-া	|	র্রা	র্সা	-া	I	র্সা	র্সা	-নর্সা	|	নর্সা	-ধা	-ণা	I
	জা	না	র্		মা	ঝে	০		অ	জা	০০		না০	০	০	
I	ধপা	-া	-া	|	-রা	-া	-া	I	রা	গা	-রা	|	গা	মা	-া	I
	রে	০	০		০	০	০		ক	রে	০		ছি	স	ন্	
I	গা	-পা	-া	|	-া	-া	-া	I	পা	-া	সা	|	রা	-া	-া	I
	ধা	০	০		০	০	ন্		বি	০	স্ম		য়ে	০	০	
I	রগা	-া	-া	|	মা	-পা	-ধপা	I	পক্ষা	-া	-া	|	-গা	-মা	-রা	I
	তা০	০	ই		জা	০	০০		গে	০	০		০	০	০	
I	রা	রা	-পা	|	ক্ষা	পা	-া	I	ক্ষা	-পা	-ধা	|	-না	-া	-া	II [] I
	জা	গে	০		আ	মা	র্		গা	০	০		০	০	ন্	

* প্রকৃতি পর্যায়ের সাধারণ উপ-পর্যায়ের এ গানটি কবি ১৯২৪ সালে ৬৩ বছর বয়সে দাদরা তালে ও মিশ্র কেদারা রাগে রচনা করেন। স্বরবিতান ৩০তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়ঃ স্বদেশ
তালঃ দাদ্‌রা

ও আমার দেশের মাটি, তোমার' পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥

ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার' পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা ॥

ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা-
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে-
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

সা | সা সা -ন্‌া II {সা ন্‌সা -রজ্ঞা | জ্ঞা রা -া I রা রা -জ্ঞা | মা পা -া I
ও আ মা র্‌ দে শে০ ০র্‌ মা টি ০ তো মা র্‌ প রে ০

||
I রমা জ্ঞা -া | রা সা -া I (-া -া ^সরা | রা সা -না)} I
ঠে০ কা ই মা থা ০ ০ ০ ও আ মা র্‌

I -া -া মা | মা মা -া I পা -া পা | পা পা -া I
০ ০ তো মা তে ০ বি শ্‌ শ ম য়ী ০

I -া -া $^{\text{প}}$মা | মা মা -া I পা -া ধা | $^{\text{ধ}}$র্সা ণা -ধা I
০ র্ তো মা তে ০ বি শ্ শ মা য়ে র্

I পধা পমা -া | গা মা -া I -া -া $^{\text{ম}}$জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -রা II
আঁ০ চ০ ল্ পা তা ০ ০ ০ "ও আ মা র্"

II -া -া -া | -া পা পা I {পা $^{\text{প}}$ধা -মা | -া পা ধা I
০ ০ ০ ০ তু মি মি শে ০ ০ ছ মোর্

I না র্সা -া | $^{\text{র্স}}$র্রাঃ -র্সাঃ -না I র্সা -া -া | -া -া -া I
দে হে র্ স ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া র্সা র্সা I না র্সা -া | র্রা র্রা -া I
০ ০ ০ ০ তু মি মি লে ০ ছ মো র্

I র্সা র্সা -র্রা | র্সা ণা -ধা} I -পা -া মা | মা গমা -পা I
প্রা ণে ০ ম নে ০ ০ ০ তো মার্ ও০ ই

I পা পা -া | পা পা -া I পা পা -ধা | $^{\text{ধ}}$র্সা ণা ধা I
শ্যা ম ল্ ব র ন্ কো ম ল্ মূ র্ তি

I পধা -পা মা | গা মা -া I -া -া $^{\text{র}}$জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -রা II
ম০ র্ মে গাঁ থা ০ ০ ০ "ও আ মা র্"

II -া -া $^{\text{স}}$রা | রা সা -ন্া I {সা ন্সা -রজ্ঞা | জ্ঞা রা -া I
০ ০ ও গো মা ০ তো মা০ ০র্ কো লে ০

I রা রা জ্ঞা | মা পা -া I মা মা -জ্ঞা | রা রজ্ঞা -মজ্ঞা I
জ ন ম্ আ মা র্ ম র ণ্ তো মা০ ০র্

I রা সা -া | (রা সা -ন্‌)} I -া -া -া | গমা গমা -পা I পা পা -ধা I
বু কে ০ ও মা ০ ০ ০ ০ তো মা র্‌ প রে ই

I ধর্সা ণা -া | ধা পা -ধপা I মা -া মা | গা মা -া I
খে লা ০ আ মা ০র্‌ দু ক্‌ খে সু খে ০

I -া -া -া | -া পা পা I {পা পধা মা | -া পা ধা I
০ ০ ০ ০ তু মি অ ন্‌ ন ০ মু খে

I না র্সা -া | র্সর্রাঃ -র্সাঃ -না I র্সা -া -া | -া -া -া I
তু লে ০ দি ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া র্সা র্সা I না র্সা -া | র্রা র্রা -া I
০ ০ ০ ০ তু মি শী ত ল্‌ জ লে ০

I র্সা র্সা -র্রা | র্সা ণা -ধা} I -পা -া মা | মা গমা -পা I
জু ড়া ০ ই লে ০ ০ ০ তু মি যে০ ০

I পা পা -া | পা পা -া I পা পা -ধা | ধর্সা ণা -ধা I
স ক ল্‌ স হা ০ স ক ল্‌ ব হা ০

I পধা পা -মা | গা মা -া I -া -া মজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -রা I
মা০ তা র্‌ মা তা ০ ০ ০ "ও আ মা র্‌"

II {সা ন্‌সা -রজ্ঞা| জ্ঞা রা -া I রা রা -জ্ঞা | মা পা -া I
অ নে০ ০ক্‌ তো মা র্‌ খে য়ে ০ ছি গো ০

I মা মা -জ্ঞা | রা রজ্ঞা -মজ্ঞা I রা সা -া | (রা সা -ন্‌া)} I -া মা মা I
অ নে ক্‌ নি য়ে০ ০০ ছি মা ০ ও মা ০ ০ ত বু

I $^{\text{গ}}$মা গমা -পা | পা পা -ধা I $^{\text{ধ}}$র্সা -ণা ণা | ধা পা -ধপা I
জা নি০ ০ নে যে ০ কী ০ বা তো মা ০য়্

I মা মা -া | গা মা -া I -া -া -া | -া পা পা I
দি য়ে ০ ছি মা ০ ০ ০ ০ ০ আ মার্

I {পা $^{\text{প}}$ধা -মা | -া পা ধা I না র্সা -া | র্রাঃ -র্সাঃ -না I
জ ন ০ ম্ গে ল বৃ থা ০ কা ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া র্সা র্সা I
জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I না র্সা -া | র্রা র্রা -া I র্সা র্সা -র্রা | র্সা ণা -ধা} I
কা টা ০ নু দি ন্ ঘ রে র্ মা ঝে ০

I -পা -া -া | মা গমা -পা I পা পা -া | পা পা -া I
০ ০ ০ তু মি০ ০ বৃ থা ০ আ মা য়্

I পা -া ধা | $^{\text{ধ}}$র্সা ণা -ধা I পধা -পা মা | গা মা -া I
শ ক্ তি দি লে ০ শ০ ক্ তি দা তা ০

I -া -া $^{\text{র}}$জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -রা II II
০ ০ “ও আ মা র্”

* দাদরা তালে কীর্তন-বাউলের বিশিষ্ট সুরে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের এ গানটি কবি ১৯০৫ সালে ৪৪ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। এ গানের সুরটি বাংলার লোকসংগীত 'আমার গৌর ক্যানে কেঁদে এলো ও নরহরি' গানের আদর্শে রচিত।

রবীন্দ্রসংগীত

তালঃ কাহারবা
পর্যায়ঃ প্রকৃতি (বর্ষা)

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতেই কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্ভ্রান্ত[১] মেঘে মন চায়
মন চায় ঐ বলাকার পথখানি নিতে চিনে ॥
মেঘমলারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান ।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা- মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে ॥

সা সা II {সা সা | রা রা I রা রা | রা গা I মা মা | পা মা I
আ জি ঝ রো ঝ রো মু খ র বা দ র দি ০

I পা -া | (সা সা)} I -া -া I পা -র্সা | র্সা -না I র্সা -া | -র্সা -র্রা I
নে ০ আ জি ০ ০ জা ০ নি ০ নে ০ ০ ০

I র্সধা -র্সা | ণা -ধা I পা -া | -গা -মা I পা পর্সা | র্সা ণা I
জা ০ নি ০ নে ০ ০ ০ কি ছু০ তে কে

I ধা পা | পধা ধপা I মা গা | মা -পা I মপা মা | জ্ঞা রা I
ন যে ম০ ন লা গে না ০ ঝ রো ঝ রো

I সা সা | রা গা I মা মা | পা -মা I পা -া | সা সা II
মু খ র বা দ র দি ০ নে ০ "আ জি

পা -া II পা -া | পা পা I পা পা | পা ধা I না না | র্সা -না I
এ ই চ ন্ চ ল স জ ল প ব ন বে ০

I $^{\text{র}}$র্সা -ণা | ণা -া I ণধা -র্সা | ণা ধা I পা -া | -া -ধা I
গে ০ উ দ্ ভ্রা০ ন্ ত মে ঘে ০ ০ ০

I -পা -ধা | ণা $^{\text{ণ}}$ধা I পা -া | -া -ধা I -পা -ধা | ণা $^{\text{ণ}}$ধা I
০ ০ ম ন চা ০ ০ ০ ০ য় ম ন

I পা -া | পা -া I পা -া | পা পা I পা পা | পা ধা I
চা য় এ ই চ ন্ চ ল স জ ল প

I না না | র্সা -না I র্সা -া | র্সা -না I র্সা -র্রা | র্রা র্রা I
ব ন বে ০ গে ০ উ দ্ ভ্রা ন্ ত মে

I র্রা -র্জ্ঞা | -া -র্রা I -র্সা -র্রা | $^{\text{র}}$র্জ্ঞা র্রা I র্সা -না | -র্সা -া I
ঘে ০ ০ ০ ০ ০ ম ন চা ০ ০ ০

I -া -া | র্সর্রা $^{\text{র}}$র্সা I ণা -ধা | -ণা -া I -া -া | পা -া I
০ য় ম০ ন চা ০ ০ ০ ০ য় ও ই

I পা পর্সা | র্সা ণা I ধা পা | পধা $^{\text{ধ}}$পা I মা গা | মা -গা I
ব লা০ কা র প থ খা০ নি নি তে চি ০

I মা -গা | মা পা I $^{\text{ধ}}$পা মা | জ্ঞা রা I সা সা | রা গা I
নে ০ আ জি ঝ রো ঝ রো মু খ র বা

I মা মা | পা -মা I পা -া | সা সা II
দ র দি ০ নে ০ "আ জি"

[ণা]
-া -া II {পণা ণা | ণা -া I ণা -ধা | ণা -া I ণধা ধর্সা | র্সা ণধা I
০ ০ মে০ ঘ ম ল্ লা ০ রে ০ সা০ রা০ দি ন০

I ণা -া | ণা ধা I পা ধা | ণা $^{\text{প}}$ধা I পা -া | পধা $^{\text{ধ}}$পা I
মা ন্ বা জে ঝ র না র গা ন্ বা০ জে

I গা গা | গা গা I মা -া | (-া -ণা)} I -া -া I {পা পা | পা পা I
ঝ র না র গা ০ ০ ন্ ০ ন্ ম ন হা রা

I পা -া | পা ধা I না -া | নর্সা -া I -া -া | -ণা -া I
বা র্ আ জি বে ০ লা০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা | ণা -ধা I র্সণা -ধা | পা -ধা I ণা -ধা | পা -া I
প থ ভু ০ লি০ ০ বা র্ খে ০ লা ০

I -া -ধা | ণা $^{\text{প}}$ধা I পা -া | -া -ধা I -পা -ধা | ণা $^{\text{প}}$ধা I
০ ০ ম ন চা ০ ০ ০ ০ য়্ ম ন

I পা -া | -া -া I -া -া | -া -া I পা $^{\text{প}}$র্সা | র্সা ণা I
চা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ হৃ দ য় জ

I ধা পা | পধা $^{\text{ধ}}$পা I মা গা | মা -গা I মা -গা | মা পা I
ড়া তে কা০ র চি র ঋ ০ নে ০ আ জি

I $^{\text{স}}$পা মা | জ্ঞা রা I সা সা | রা গা I মা মা | পা -মা I
ঝ রো ঝ রো মু খ র বা দ র দি ০

I পা -া | সা সা II II
নে ০ "আ জি"

* কাহারবা তালে ও মিশ্র মল্লার রাগে রচিত এ গানটি কবি ১৯৩৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিতান ৫৯তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লি-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি-জলে ঝলমল করে লাবণী ॥

রৌদ্র-তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম-কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল;
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥

কেতকী-কদম-যুথিকা-কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে-পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥

শাপলা-শালুক সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীত গাহিয়া।
অঘ্রাণে মা গো আমন-ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী ॥

শীতের শূন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে গো কীর্তন শোনো রাতে মা
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

II {সা গা গা | গা গা -মা I পা না র্সনা | ধা পা -া | পা ধা পধপা I
এ কি অ প রু প্ রু পে মা০ তো মা য় হে রি নু০০

I মা -গা গমা I রগা গমা গা | -া -া -া} I গপা পা পা | পা পা পা I
প ল্ লী০ জ ন নী ০ ০ ০ ফু লে ও ফ স লে

২০২৫ I গপা পধা ধা I ধা ধা ধা | পধা ধনা না} I -া না নর্সা | ধনা নর্রা র্সা I
কা দা০ ম টী জ লে ঝ০ ল০ ম ল্ ক রে০ লা০ ব০ নী

I -না ধা পা I পা ধা পধপা| মা -গা গমা I রগা ^{গ}মা গা | -া -া -া I
০ ০ ০ হে রি নু০০ প ল্ লী০ জ ন নী ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা | না -া না I পা -া পা | না না না I গা মা পা | -না না নর্সা I
রৌ ০ দ্র ত প্ ত বৈ ০ শা খে তু মি চা ত কে র্ সা থে০

I ধনা নর্রা র্সা | -া -া -া I মা -া মা | মা মা -া I মা মা -া | পা -া পা I
চা০ হ০ জ ০ ০ ল্ আ ম্ কাঁ ঠা লে র্ ম ধু র্ গ ন্ ধে

I মা -ধা পধপা| মা গা -মা I ন্ রা সা | -া -া -া I সা -া সা | -া ^{স}ধ্া ণ্া I
জ্যৈ০ ০ ষ্ঠে০০ মা তা ও ত রু ত ০ ০ ল্ ঝ ন্ ঝা র্ সা থে

I সা -া সন্া | রা ^{ন}ন্া সা I সা মা গা | পা ক্ষা ধা I পা না ধনা| -র্সনা -ধপা-ক্ষপা I
প্রা ন্ ত০ রে মা ঠে ক ভু খে ল ল' য়ে অ শ নি০ ০০ ০০ ০০

I পা ধা পধপা | মা -গা গমা I রগ ^{গ}মা গা | -া -া -া II
হে রি নু০০ প ল্ লী০ জ০ ন নী ০ ০ ০

I সা সা সা | ^{স}পা পা -া I ^{প}ক্ষা ক্ষা ক্ষা | ক্ষা ক্ষা ক্ষা I $^{ক্ষ}$মা -া মা | -া মা গা I
কে ত কী ক দ ম্ যু থি কা কু সু মে ব র্ ষা য়্ গাঁ থ

I রা মা গা | -া -া -া I গা মা পা | রা রা -া I গা মা পা | রা রা -া I
মা লি কা ০ ০ ০ প থে অ বি র ল্ ছি টা ই য়া জ ল্

I সা ন্া রা | -ঋা রা গা I মা গা মা | -া -া -া I গা গর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
খে ল চ ন্ চ ল বা লি কা ০ ০ ০ ত ড়া০ গে পু কু রে

I না -া না | -ধা ধা ধা I মা গা মা | মধা দা -ধা I না নর্রা র্সা | -া -া -া I
থ ই থ ই ক রে শ্যা ম ল শো০ভো র্ ন ব০ নী ০ ০ ০

I সা -া ধ্া | সা সা রা I রা গা গা | গা গা গা I হ্মা হ্মা হ্মা | হ্মা হ্মা হ্মাপা I
শা প্ লা শা লু ক সা জা ই য়া সা জি শ র তে শি শি রে০

I গহ্মা হ্মা পা | -া -া -া I হ্মা -পা ধা | গা গা গা I গা ʼনা না | ধা পা পা I
না০ হি য়া ০ ০ ০ শি উ লি ছো পা ন সা ড়ি প' রে ফে র

I হ্মা পা ধা | গা গা গা I গন্া রা সা | -া -া -া I র্সা -া র্সা | না র্সা না I
আ গ ম নী গী ত গা হি য়া ০ ০ ০ অ ০ ঘ্রা ণে মা গো

I ধা ধা ধা | দা ধা -া I ধনা -া না | না না নর্সা I ধনা নর্সা র্সা | -া -া -া II
আ ম ন ধা নে র্ সু০ ০ ঘ্রা ণে ভ রে০ অ০ ব০ ণী ০ ০ ০

II সা সা -পা | পা -া পা I পা পা পা | পা মা গা I গা মা পা | ধা না -র্সা I
শী তে র্ শূ ০ ন্য মা ঠে ফে র তু মি উ দা সী বা উ ল্

[র্সর্রা
I ধা না ধপা | -া -া -া I পা পর্সা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা র্সর্রা র্রা | -া র্রা র্রগা I
সা থে মা ০ ০ ০ ভা টি০ য়া লী গা ও মা ঝি০ দে র্ সা থে

না -া -া -া -া -া]
I র্সর্রা -া -া | -র্গা -র্সর্রা -া I (-া -র্গর্মা -র্সর্রা | -র্সা -া -র্রা I র্সর্রা -র্সা -া | -র্রর্সা -না -া I
গো০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া নর্সা-ধনা | -পা -া -ধনা I -পধা-পা -া | -া -া -া} I ʼনা -া না | না না নর্সা I
০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ কী র্ ত ন শো ন০

I ধা না না | -া -া -নর্সা I -ধনা -া -া | -া -া -র্সা I -ধনা -া -ধনা | -র্সা -নর্সনা -ধা I
রা তে মা ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০০ ০

I -পধা-পা -া | -া -া -া I পা -ধা পধপা | মা গা মা I পা পা ক্ষা | $^{\text{প}}$ধা ধা পা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ফা ল্ গু০০ নে রা ঙা ফু লে র আ বী রে

I পধা ধা -পা | $^{\text{ধ}}$না না -ধা I না নর্রা র্সা | -না -ধা পা I পা ধা পধপা | মা -গা গমা I
রাং০ ঙা ও নি খি ল্ ধ র০ ণী ০ ০ ০ হে রি নু০০ প ল্ লী০

I রগা $^{\text{গ}}$মা গা | া -া -া II II
জ০ ন নী ০ ০ ০

* বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহুল গীত, জনপ্রিয় এই গানটি কীর্তন সুরে, দাদরা তালে রচিত। বাংলার ষড়ঋতুর নৈসর্গিক রূপটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে গানটিতে। ১৯৩৩ সালে টুইন রেকর্ডস কোম্পানি থেকে শিল্পী মাস্টার কমল এই গানটি রেকর্ড করেন। সুর-লিপি বইটিতে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্ বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

আস্‌লো এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙলো আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্রধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!
ওরে ওই আসছে ভয়ংকর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে!

বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ংকর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

মাভৈঃ ওরে মাভৈঃ মাভৈঃ জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে।
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
তরুণ বেশে!

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর!
আলো তার ভ'রবে এবার ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

১০১৬ COLUMBIA GE. 7458।। শিল্পীঃ বাংলার সন্তান দল।। সুরঃ নিতাই ঘটক
জাতীয় সংগীত।। তালঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

I -া -া সা | সা সা -রা II গা গাঃ পঃ | ^{গ}গাঃ রঃ -া I
০ ০ তো রা স ব্ জ য় ০ ধ্ব নি ০

I সা -া সা | সা সা -রা II গা গাঃ -পঃ | ^{গ}গাঃ রঃ -া I
ক ব তো রা স ব্ জ য় ০ ধ্ব নি ০

I সা -া -া | -া -া -া II {^{স}গা -া পা | পা পা -া I
ক ০ ০ ০ ০ র্ ঐ ০ নূ ত নে র্

I পা পা -া | ধা না -া II পা -া না | ধা পা -া I
কে ত ন্ ও ড়ে ০ কা ল্ বো শে খী র্

I ^{গ}গা -া সা | সা সা -রা I (গা গাঃ -পঃ | ^{গ}গাঃ রঃ -া I
ঝ ড় তো রা স ব্ জ য় ০ ধ্ব নি ০

I সা -া -া | -া -া -া)} II
ক ০ ০ ০ ০ র্

II {^{গ}পা -া গা | পা পা -া II পা ধা -া | পা ধা -া I
আ স্ লো এ বা র্ অ না ০ গ ত ০

I গা গা -র্সা | র্সা র্সা -া II র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I
প্র ল য় নে শা র্ নৃ ০ ত্য পা গ ল্

II র্সা -া র্রা | র্রা র্রা -র্সা I র্সা -া র্রা | র্রর্গাঃ গঃ -র্রা I
সি ন্ ধু পা রে র্ সিং ০ হ দ্বা০ রে ০

I $^{র্}$র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -না II -ধা -া র্সা | না ধপা -া} I
ধ ম ক্ হে নে ০ ভাঙ ০ লো আ গ০ ল্

I পা -া ধা | ধা র্সানা -া I ধা -া ধা | ধা ধা -া I
মৃ ০ ত্যু গ হ০ ন্ অ ন্ ধ কূ পে ০

I গা গর্সা -া | র্সা র্সা -না I ধা -া র্সা | না ধপা -া I
ম হা ০ কা লে র্ চ ন্ ড রূ পে০ ০

I পা -া ধা | ধা র্সনা -া I ধা -া ধা | ধা ধাঃ -গঃ I
মৃ ০ ত্যু গ হ০ ন্ অ ন্ ধ কূ পে ০

I -া -া গা | র্সা র্সা না I ধা -া র্সা | না ধপা -া I
০ ০ ম হা কা লের্ চ ন্ ড রূ পে০ ০

I ধা -া র্সা | না র্সা -া I -া -া -া | -া -া -া I
ধু ম্ র ধূ পে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া ধা | ধা ধা -া I পা ধা -া | না ধা -া I
ব ০ জ্র শি খা র্ ম শা ল্ জ্বে লে ০

I পা -া ধা | না ধা -া I ধপা -া গা | রা সা -রা I
আ স্ ছে ভ য়ং ০ ক র্ ও রে ঐ ০

I গা -া পা | গা রা -া I গসা -া সা | সা সা -রা II
আ স্ ছে ভ য়ং ০ ক র্ তো রা স ব্

II {সা সা -ধ্া | সা সা -রা I রা -গা গা | গা গা -া I
দ্বা দ শ্ র বি র্ বন্ ০ হ্নি জ্বা লা ০

I সা সা পা | পা পা -া I মা মা -পা | পা মা -পা I
ভ য়া ল্ তা হা র্ ন য় ন্ ক টা ০

I -গমা -গা -া | -া -া -া I গা গা -পা | পা পা -া I
০০ ০ ০ ০ ০ য়্ দি গ ন্ ত রে র্

I গা পা -া | ধা না -া I পা -া না | ধা পা -া I
কাঁ দ ন্ লু টা য়্ পি ঙ্ গ ল তা র্

I গা -া গা | রা সা -া} I {পা -া গা | পা পা ধা I
ত্র স্ ত জ টা য়্ বি ন্ দু তা হা র্

I ধা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা -া র্রা | র্মা $^{\text{র্ম}}$র্গর্রা -া I
ন য় ন্ জ লে ০ স প্ ত ম হা ০

I র্সা -া র্সা | না ধপা -া I ধা ধা -র্সা | না র্সা -া I
সি ন্ ধু দো লে০ ০ ক পো ল্ ত লে ০

I -া -া -া | -া -া $^{\text{প}}$-া} I {পা -া ধা | ধা ধা -পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ বি ০ শ্ব মা য়ে র্

I পা ধা -া | না ধপা -া I পা ধা -া | $^{\text{ধ}}$না ধা -া I
আ স ন্ তা রি০ ০ বি পু ল্ বা হু র্

I $^{\text{ধ}}$পা -া গা | গা সা -রা I গা -া পা | গা -রা -া I
প র্ হা কে ঐ ০ জ য়্ প্র ল ঙ্ ০

II ($^{\text{স}}$সা -া -া | -া -া -া)} I $^{\text{স}}$সা -া সা | সা সা -রা II
ক ০ ০ ০ ০ র্ ক র্ তো রা স ব্

[-া]
০
I {পা র্সা -া | -া -া -া I $^{\text{প}}$-া -া -া | -া -া (পা)} I
মা ভৈঃ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ওরে

I {পা -া গা | পা পা -া I পা ধা -া | পা ধা -া I
মা ০ ভৈঃ মা ভৈঃ ০ জ গ ৎ জু ড়ে ০

I গা গর্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
প্র ল০ য় এ বা র্ ঘ নি য়ে আ সে ০

I র্সা র্সা -র্রা | $^{\text{র্সা}}$র্রা র্রা -র্সা I র্সা র্রা -া | $^{\text{র্রা}}$র্গা র্গা -র্রা I
জ্ব রা য় ম রা ০ মূ মু র্ষু দে র্

I $^{\text{র্রা}}$র্সা -া র্সা | র্সা র্সনা -া I ধর্সা -া র্সা | না ধপা -া} I
প্রা ণ্ লু কা নো০ ০ ঐ০ ০ বি না শে০ ০

[ধর্সাঃ নর্সনঃ]

I {পা ধা -া | র্সা $^{\text{র্সা}}$না -া I ধা ধা -া | ধা ধা -া I
এ বা র্ ম হা ০ নি শা র্ শে ষে ০

I গা -া গর্সা | র্সা না -া I ধা ধা না | না ধপা -া I
আ স্ বে০ উ ষা ০ অ রু ণ্ হে সে০ ০

I ধা ধা -র্সা | না নাঃ -র্সঃ I -া -া -া | -া -া -া I
ত রু ণ্ বে শে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -ধা | ধা ধা -পা I পা ধা -া | না ধা -া I
দি গ ম্ ব রে র্ জ টা য় লু টা য়্

I পা ধা -া | না ধা -া I $^{\text{ধ}}$পা -া গা | রা সা -রা I
শি শু ০ চাঁ দে র্ ক র্ আ লো তা র্

I গা -া পা | গা রা -া I ᵍসা -া সা | সা সা -রা II II
ভ ব্ বে এ না র ঘ র্ তো রা ঘ ব

গানের শেষে "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" ২বার ব'লে
তৃতীয় বার এভাবে ব'লে গান শেষ হয়েছে।

সা | সা সা রা I গা গাঃ -পঃ | ᵖগাঃ রঃ -া I সা -র্সা -া | -া -া -া I
তো রা স ব্ জ য় ০ ধ্ব নি ০ ক ০ ০ ০ ০ র্

* গানটিতে নবীনের জয়গান করেছেন কবি। দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটি। ১৯২২ সালে রচিত হলেও ১৯৪৯ সালে নিতাই ঘটককৃত পরিবির্তিত সুরে কলম্বিয়া রেকর্ডস থেকে রেকর্ড করা হয়। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল-সংগীত স্বরলিপি' বইটির পঞ্চম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

মরুর ধূলি উঠ্‌লো রেঙে রঙীন গোলাপ-রাগে
বুলবুলিরা উঠ্‌লো গেয়ে মক্কার গুল্ বাগে ॥

খোদার প্রেমের কোন্ দিওয়ানা
দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা,
নবীন আশার আলোক পেয়ে, ঘুমন্ত সব জাগে ॥

এ কোন্ তরুণ প্রেমিক এলো কা'বার অঙ্গনে
সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুক্‌নো খেজুর বনে।

এলো নব দীনের নকীব
চির-চাওয়া খোদার হাবীব
নিখিল পাপী-তাপী যাঁহার পায়ের পরশ মাগে ॥

TWIN F.T. 12580 ॥ শিল্পীঃ আবদুল লতিফ ॥ ইসলামী ॥ তালঃ কাহারবা

II {-া -া রা রা | -জ্ঞা রা সা -া I $^{\text{গ}}$রা $^{\text{ম}}$-া $^{\text{ম}}$গা -া | $^{\text{প}}$মা -া পা -া I
০ ০ ম রু র্ ধূ লি ০ উ ঠ্ ল ০ রে ০ ঙে ০

I (-া ধপা মা গা | -া মা পা -ধপা I মা -গা -মা -পধা | -জ্ঞা -রা -জ্ঞাঃ -সঃ)} I
০ ০০ র ঙীন্ ০ গো লা ০প্ রা ০ ০ ০০ গে ০ ০ ০

[ধণা -র্সণা -া ধা পা -া
I {ধা -া -া ধা | ধা -া ধা -া I ধা -া ণর্সা -ণা | -া (ণধা পা -মা)}I
বুল্ ০ ০ বু লি ০ রা ০ উ ঠ্ ল০ ০ ০ গে০ য়ে ০

I -া -া গা গা | -া মা পধা -পা I মা -গা -মপা -মা | -জ্ঞা -রা -সা -া I
০ ০ ম ক্কা র্ গুল্ বা০ ০ গে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা -া | মা -া পধা -পা I মা -গা -মগা -মা | -জ্ঞা -রা -জ্ঞা -র্সা I
ম ক্ কা র্ গু ল্ বা০ ০ গে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

II {-া -া মা মধা | -পা মা জ্ঞা -মা I পা না না -র্সা | র্সা -া র্সাা -া I
০ ০ খো দা০ র্ প্রে মে র্ কো ন্ দি ০ ওয়া ০ না ০

[-া]
I -া -া র্সা র্সা | -র্জ্ঞা র্রা র্সা -া I না -া নর্সা -না | ধাঃ -পঃ পা (-মা) I
০ ০ দ্বা রে ০ দ্বা রে ০ দে য়্ রে০ ০ হা ০ না ০

[পা -া]
I {-া -া ধা ধা | -া ণা র্সর্রা -র্সা I ণা -ধা ণর্সা -ণা | ধা -পা (মগা -মা) I
০ ০ ন বী ন্ আ শা০ র্ আ ০ লো০ ক্ পে ০ য়ে০ ০

I -া -া মগা গা | -া মা পধা -পা I মা -গা -মগা -মা | জ্ঞা -রা -সা -া I
০ ০ ঘু ম ন ত স০ ব্ জা ০ ০০ ০ গে ০ ০ ০

I গা -া গা -া | মা -া পা -া I মা -গা -মগা -মা | জ্ঞা -রা -জ্ঞা -সা II
ধু ০ ম ন্ ত ০ স ব্ জা ০ ০০ ০ গে ০ ০ ০

শেয়রঃ
র্রা র্রা -া -া -া -া র্সা র্রা -া -া -া -া -া র্সর্রা র্রা -া র্রা র্জ্ঞর্রা -র্জ্ঞা
এ কো ০ ০ ০ ন্ ত রু ০ ০ ণ্ ০ ০ প্রে০ মি ক্ এ ল০ ০

-া -া -া -র্রর্সা -া র্সর্রা সর্ণা -া -া -ধপা -া -া পধা -নর্সা না র্সা -া -া -া
০ ০ ০ ০০ ০ কা০ বা০ ০ ০ ০০ র্ ০ অ০ ০ছ্ গ নে ০ ০ ০

-া -া -া -া র্সর্রা সর্রাঃ -ণঃ -া ণা ণা -া -ধপা পধা পধাঃ -মঃ -া মা মা -া -গরা
০ ০ ০ ০ স০ বু০ ০ জ্ পা তা ০ ০র নি০ শা০ ০ ন্ দো লা ০ ০য়্

-া -া রা -জ্ঞা জ্ঞা রা সা -রসা সন্‌া সা -া -া -া
০ ০ শু ক্ নো খে জু ০র্ ব নে ০ ০ ০

II মা -া $^{\text{ম}}$ধাঃ -পঃ | মাঃ -জ্ঞঃ জ্ঞা -মা I -া -া না না | -র্সা র্সা র্সা -া I
এ ০ ল ০ ন ০ ব ০ ০ ০ দী নে র্ ন কী ব্

I -া -া র্সা র্সা | -র্জ্ঞা র্রা র্সা -া I $^{\text{র্স}}$না -া $^{\text{ন}}$র্সা -না | ধাঃ -পঃ পা -া I
০ ০ চি র ০ চাও য়া ০ খো ০ দা র্ হা ০ বী ব্

I -া -া মা মধা | -পা মা $^{\text{ম}}$জ্ঞা -মা I পা -না না -র্সা | র্সা -া র্সা -া I
০ ০ এ ল০ ০ ন ব ০ দী ০ নে র্ ন ০ কী ব্

I -া -া র্সা র্সা | -র্জ্ঞা র্রা র্সা -া I $^{\text{র্স}}$না -া $^{\text{ন}}$র্সা -না | ধাঃ -পঃ পঃ -া I
০ ০ চি র ০ চা০ য়া ০ খো ০ দা র্ হা ০ বী ব্

[পা -া]
I {-া -া ধা ধা | -া ণা র্সর্রা -র্সা I ণা -ধা ণর্সা -ণা | ধা -পা (মগা -মা)I
০ ০ নি খি ল্ পা পী০ ০ তা ০ পী০ ০ যাঁ ০ হা০ র্

I -া -া মপা গা | -া মা পা -ধপা I মা -গা -মগা -মা | জ্ঞা -রা -সা -া I
০ ০ পাঁ০ য়ে র্ প র ০শ্ মা ০ ০০ ০ গে ০ ০ ০

I মপা -া গা -া | মা -া মপা -না I না -গা -মগা -মা | -জ্ঞা -রা জ্ঞাঃ -সঃ I
পাঁ০ ০ য়ে র্ প ০ রশ ০ মা ০ ০০ ০ গে ০ ০ ০

* বাংলা ভক্তিগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম সংযোজন করেন ইসলামী গান। উক্ত গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ। নবীর প্রেম বিষয়ক একটি ইসলামি গান। ১৯৩৮ সালে টুইন রেকর্ডস থেকে শিল্পী আবদুল লতিফ এই গানটি রেকর্ড করেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল-সংগীত স্বরলিপি' বইটির ষষ্ঠ খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ কে বাজায়
জল- ঝুম্‌ঝুমি।
চমকিয়া জাগে-
ঘুমন্ত বনভূমি ॥

দুরন্ত অরণ্যা গিরি-নির্ঝরিণী
রঙ্গে সঙ্গে ল'য়ে বনের হরিণী।
শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায়
ভীরু মুকুলের কপোল চুমি ॥

কুহু-কুহু কুহরে পাহাড়ী কুহু
পিয়াল ডালে,
পল্লব-বীণা বাজায় ঝিরি ঝিরি সমীরণ
তারি তালে তালে।

সেই জল ছলছল সুরে জাগিয়া,
সাড়া দেয় বন পারে সাড়া দেয়
বাঁশী রাখালিয়া,
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি
বলে - "চঞ্চলা কে গো তুমি?"

রাগ: নির্ঝরিণী
আরোহী: স প গ ম প র্স।
অবরোহী: র্স দ প ম গ ম ঋ স।
বাদী: প, সম্বাদী: স। অবরোহীতে 'নিখাদ' (তীব্র) গুপ্ত।

II সা পা -া গা | মা পা -া $^{\text{গ}}$র্সা I র্সদা -$^{\text{প}}$দা পা -া | মগা মা ঋা সা I
রুম্ ঝু ম্ রু মু ঝু ম্ কে বা০ ০ জা য়্ জল ঝুম্ ঝু মি

I দপা দপা মা -গা | মা -া -ঋা -া I মগা মা -ঋা সা | গমা পা দপা $^{\text{গ}}$গমা I
চম কিয়া জা ০ গে ০ ০ ০ ঘু০ ম ন্ ত ব০ ন ভূ০ মি০

II গমা পর্সা -া র্সা | দপা পর্সা -া র্সা I ঋর্সা র্মগা র্মঋা র্সা | -া -া -া -া I
দু০ র০ ন্ ত অ০ র০ ০ ণ্যা গিরি নির্ ঝরি ণী ০ ০ ০ ০

I র্সা না দা র্সা | -না দা পা পা I গমা পা -া দপা | মা -া -^{প}গা -া I
র ০ ঙ্গে স ০ ঙ্গে ল' য়ে ব০ নে র্ হরি ণী ০ ০ ০

I গমা পা গমা পা | দপা -মগা মা -া I মগা মঋা সা -া | পা মগা ঋা সা II
শা০ খায় শা০ খায় ঘু০ ম্‌ভা ঙ্গা য় ভীরু মুকু লে র্ ক পোল্ চু মি

II প্‌সা প্‌সা গঋা সা | মগা ঋসা সা সা I -া -া -া -া | গা মপা দা পা I
কুহু কুহু কুহ রে পা০ হাড়ী কু হু ০ ০ ০ ০ পি য়াল্ ডা লে

I পা গমা পমা পঃ^{প}র্সঃ | নদা -া -া -া I দপা দপা মগা ^{প}ঋা | মগা মঋা সা সা I
পল্ লব বী০ ণাবা জা০ ০ ০ য় ঝিরি ঝিরি সমী রণ্ তারি তালে তা লে

I ঋর্সা মর্গা মর্ঋা র্সর্সা | দা পা -া -া I র্সদা পা -া -া | দপা মা -া -া I
সেই জল ছল ছল সু রে ০ ০ জাগি য়া ০ ০ সাড়া দে ০ য়্

I গমা পা ^{প}র্সা -া | দপা মা -া -া I গমা পা দপা মগা | মা -^{প}মা -গা -া I
বন পা রে ০ সাড়া দে ০ য় বাঁ০ শী রা০ খালি য়া ০ ০ ০

I পা গমা পা গম | পমা পঃ^{প}র্সঃ নদা -া I দপা মা ^{প}ঋা সসা | গমা পা ^{প}দপা মা IIII
প ল্লীর প্রাণ্ তর ওঠে শিহ রি০ ০ ব০ লে চন্ চলা কে গো তু০ মি

---

* নজরুল সৃষ্ট নির্ঝরিণী রাগে নির্ঝরিণীর পাহাড়ি ঝরণার গান। নবরাগ মালিকা (বেতারে প্রচারিত নজরুল সৃষ্ট নতুন রাগের অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠানে শিল্পী গীতামিত্র ১৯৪০ সালে এই গানটি পরিবেশন করেন। তাল ত্রিতাল। নবরাগ বইটিতে এই গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

থির হয়ে তুই ব'স দেখি মা
খানিক আমার আঁখির আগে
দেখব নিত্য লীলাময়ী
থির হলে তুই কেমন লাগে ॥

শান্ত হ'লে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখবো চেয়ে (মা গো)
চিন্ময় শিব শম্ভু কেন
চরণ-তলে শরণ মাগে ॥

দেখবো চেয়ে জননী তুই
সাকারা না নিরাকারা
কেমন ক'রে কালি হয়ে
নামে ব্রহ্ম জ্যোতিধারা ।

কোলে নিতে কোলের ছেলে
শ্মশান জাগিস বাহু মেলে
কেমন ক'রে মহামায়া
তোর বুকে মায়া জাগে ॥

H.M.V. N 17765 ।। শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ সুরঃ কাজী নজরুল ইসলাম ॥ তালঃ ঝাঁপতাল

আলাপ :

$^{\text{প}}$মা -া -া -া $^{\text{ম}}$-গা $^{\text{গ}}$-রা $^{\text{র}}$-সা -া
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা -রা | $^{\text{র}}$মা -া মা | পা পা | পা পধা -নর্সা I
থির্ হ' য়ে ০ তুই বোস্ দে খি মা০ ০০

I $^{\text{র্স}}$না ধা | পধপাঃ -সঃ মা | পা পা | পা পা -া I
থির্ হ য়ে০০ ০ তুই বোস্ দে খি মা ০০

[ধর্রা র্সর্রা -র্সা]
I {পা ধা | ধর্সা র্সা -া | না র্সা | র্সনা নধাঃ -পঃ} I
খা নিক্ আ মা র্ আঁ থির্ আ গে ০

[পমা]
I {পা ধা | ধা -া ণধা | পা ধা | পা পধাঃ -পধপমা I
দেখ্ ব নি ০ ত্য০ লী লা ম য়ী০ ০০০০

I মা পা | মপা -ধণা ধা | পধপা মা | পগগা রাঃ -সঃ} I
থির্ হ লে০ ০০ তুই কে মন্ লা গে ০

I {পা পা | ধা সর্ধা -র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
শান্ ত হ' লে০ ০ ডা কাত্ মে য়ে ০

I (র্সা র্রা | র্রা র্সর্রর্গা -া | গর্রা র্সা | নর্সনা ধাঃ -পঃ)} I
কে মন্ দে খা০০ য় দেখ্ বো চে য়ে ০

I নর্সা -র্রর্গা | -র্মা -া -া | -া -া | -া -া -া I
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্গাঃ -র্রঃ | -া -া -া | -া -া | -া -া -র্গাঃ I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্সা -র্রা | -র্মাঃ -র্গঃ -র্রর্গর্রা | -র্সা -া | -না -ধপা -ধা)} I
গো ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০০ ০

I র্সা র্রা | র্রা র্সর্রর্গা -া | গর্রা র্সা | নর্সনা ধাঃ -পঃ I
কে মন্ দে খা০০ য় দেখ্ বো চে য়ে ০

I {পা ধা | ধা -া ণা | পা ধা | পা পাঃ -মঃ I
চিন ময় শি ০ ব শম ভ কে ন ০

					[-মপা	মগা		গরা	রা		গরা	-সরাঃ	রঃ]	
I	{সা	-সা	|	রগা	-মা	গরা	|	রা	রা	|	রা	-া	রা	I
	দেখ্	বো		চে০	০	য়ে০		জ	ন		নী	০	তুই	
I	মা	মা	|	মগা	-রগরা	$^{\text{গ}}$সা	|	রা	পা	|	পা	পা	-া}	I
	সা	কা		রা০	০০০	না		নি	রা		কা	রা	০	
I	[$^{\text{প}}$মা	ধা	|	ধা	ধা	-া	|	ধা	ণা	|	ধা	ণধা	-পমা	I
	কে	মন্		ক'	রে	০		কা	লি		হ	য়ে০	০০	
I	মা	পা	|	পা	-া	পা	|	ধা	$^{\text{র}}$র্সা	|	নর্সনা	$^{\text{প}}$ধাঃ	-পঃ}	I
	না	মে		ব্রহ্ম	০	হ্		জ্যো	তি		ধা০০	রা	০	
I	পা	পা	|	র্সধা	-র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I
	কো	লে		নি০	০	তে		কো	লের্		ছে	লে	০	
I	র্সা	র্রা	|	র্রা	র্সর্রা	-র্গা	|	$^{\text{গ}}$র্রা	$^{\text{র}}$র্সা	|	নর্সনা	ধাঃ	-পঃ}	I
	শ্ম	শান্		জা	গি০	স্		বা	হু		মে০০	লে	০	
I	{পা	ধা	|	$^{\text{প}}$ধা	-া	ধা	|	পা	ধা	|	পা	ধপা	-মা	I
	কে	মন্		ক'	০	রে		ম	হা		মা	য়া০	০	
I	মা	-পা	|	মপা	-ধণা	ধা	|	$^{\text{ধ}}$পা	$^{\text{প}}$মা	|	গমগা	রাঃ	-সঃ}	II II
	তো	র্		বু০	০০	কে		মা	য়া		জা০০	গে	০	

---

* বাংলাসংগীতে একটি বিশেষ ধারা শ্যামাসংগীত। সংগীতে বিচিত্র বিষয় বিহারী কাজী নজরুল ইসলামের এই গানটি রামপ্রসাদী সুরে ও ঝাঁপতালে নিবদ্ধ একটি শ্যামাসংগীত। ১৯৪০ সালে এইচ এম ভি কোম্পানি থেকে গানটি প্রথম রেকর্ড হয়। শিল্পী ছিলেন মৃণালকান্তি ঘোষ। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল-সংগীত স্বরলিপি' বইটির ১৩তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

নজরুলসংগীত

হেমন্তিকা এসো এসো
হিমেল শীতল বন-তলে
শুভ্র পূজারিণী বেশে
কুন্দ-করবী-মালা গলে ॥

প্রভাত শিশির নীরে নাহি'
এসো বলাকার তরণী বাহি'
সারস মরাল সাথে গাহি'
চরণ রাখি' শতদলে
হিমেল শীত বন-তলে ॥

ভরা নদীর কূলে কূলে
চাহিছে সচকিতা চখী-
মানস-সরোবর হ'তে-
অলক -লক্ষ্মী এলো কি ?

আমন ধানের ক্ষেতে জাগে
হিল্লোল তব অনুরাগে,
তব চরণের রঙ লাগে
কুমুদে রাঙা কমলে ॥

TWIN FT. 4107 ॥ শিল্পী: ইন্দুসেন ॥ ঋতুভিত্তিক ॥ তাল: কাহার্‌বা

II {$^{\text{ম}}$গা মা | $^{\text{ম}}$-পা দা I পা -মা | $^{\text{ম}}$গা পমা I মঋা -া | -ঋা$^{\text{স}}$ -ঋা$^{\text{স}}$ I $^{\text{ঋ}}$সা -া | -া -া I
হে ম ন্ তি কা ০ এ সো০ এ০ ০ ০ ০ সো ০ ০ ০

I $^{\text{ম}}$গা মা | পা $^{\text{প}}$দা I পা দা | মা পা I মগা -া | মা -া I -া -া | -া -া} I
হি মে ল শী ত ল ব ন ত০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I {পদা -া | দা দা I দা -া | দা দপা I দপা দা | -গা -দা I $^{\text{দ}}$পা -া | -া -া} I
শু০ ০ ভ্র পু জা ০ রি ণী০ বে০ ০ ০ ০ শে ০ ০ ০

I $^{\text{দ}}$দাঃ -র্সাঃ| না দা I $^{\text{দ}}$দা পা | $^{\text{প}}$মা পা I $^{\text{ম}}$গা -গপা| মা -া I -া -া | -া -া} II
কু ন্ দ ক র বী মা লা গ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০

II $^{\text{প}}$দা দা | -া দা I $^{\text{দ}}$না না | র্সা র্ঋর্সা I র্সনাঃ -র্সাঃ| র্সা -া I -া -া | দা র্দর্ঋা I
প্র ভা ত্ শি শি র নী রে০ না০ ০ হি ০ ০ ০ এ স০

I র্ঋা র্ঋা | র্ঋা -া I র্ঋা র্ঋা | র্ঋাঃ -র্সাঃ I $^{\text{ঋ}}$র্সাঃ -র্ঋাঃ| -র্ঋর্জ্ঞা -র্ঋা I $^{\text{ঋ}}$র্সা -া | -া -া} I
ব লা কা র্ ত র ণী ০ বা ০ ০০ ০ হি ০ ০ ০

I র্সা র্সর্ঋা| র্সা ণা I $^{\text{ণ}}$দা পা | $^{\text{প}}$মা পা I মগা -মা| মদা -া I -া -া | -া -া I
সা র০ স ম রা ল সা থে গা০ ০ বি০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পণা| $^{\text{ণ}}$দা পা I $^{\text{প}}$মা -া | গা পমা I $^{\text{গ}}$ঋা -া | -া -া I $^{\text{ঋ}}$সা -া | -া -া I
চ র০ ণ রা খি ০ শ ত০ দ ০ ০ ০ লে ০ ০ ০

I $^{\text{ম}}$গা মা | পা $^{\text{প}}$দা I পা দা | মা পা I মগা -া | মা -া I -া -া | -া -া} II
হি মে ল শী ত ল ব ন ত০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

II মগা মা | পা -পদা I $^{\text{দ}}$পপা $^{\text{প}}$-মা| $^{\text{গ}}$ঋা ঋা I $^{\text{ঋ}}$সা -া | -া -া I দর্ঋা -া | র্ঋা র্ঋা I
ভ০ রা ন দীর্ কু০ ০ লে কু লে ০ ০ ০ চা০ ০ হি ছে

I র্সা র্ঋা | র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা I $^{\text{ঋ}}$র্সা -না | র্সা -া I -া -া | -া -া I র্সা -র্সর্ঋা| র্সা ণা I
স চ কি তা০ চ ০ খী ০ ০ ০ ০ ০ মা ০০ ন স

I $^{\text{ণ}}$দা পা | মা পা I মগা -মা | মদা -া I -া -া | -া -া I পা পণা| দা পা I
স র ব র হ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ অ ল০ ক ল

I -দা ^{দ}মা | মগা মা I মদা -া | -া -া I দপা -দা | ^{দ}মা -া I ^{ম}গা ঋা | ^{ঋ}সা -া I
০ ক্ষী এ০ ল কি০ ০ ০ ০ ল০ ০ ক্ষী ০ এ ল কি ০

I -া -া | -া -া I {মদা দা | -া দা I না -া | র্সা ঋর্সা I র্সনা -র্সা | র্সা -া I
০ ০ ০ ০ আ০ ম ন্ ধা নে র্ ক্ষে তে০ জা০ ০ গে ০

I -া -া | -া -া I র্সা -র্রা | র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা I র্সা র্রা | র্জ্ঞা র্মা I ^{ঋ}র্সা -না | র্সা -া I
০ ০ ০ ০ হি ল্ লো ল০ ত ব অ ন্ বা ০ গে ০

I -া -া | -া -া} I র্সা ^{গ}র্ঋা | ^{ঋ}র্সা ^{গ}ণা I ^{প}দা পা | মা -পা I মগা -মা | ^{ম}দা -া I
০ ০ ০ ০ ত ব চ র ণে র র ঙ্ লা০ ০ গে ০

I -া -া | -া -া I দণা দা | পাঃ -মঃ I মগা মা | মঋা ঋা I ^{ঋ}সা -া | -া -া} I
০ ০ ০ ০ কু০ মু দে ০ রা০ ঙা ক০ ম লে ০ ০ ০

I ^{ম}গা মা | পা ^{প}দা I পা দা | মা পা I মগা -া | মা -া I -া -া | -া -া II II
হি মে ল শী ত ল ব ন ত০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

* গানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ একটি ঋতুভিত্তিক গান। হেমন্তে বাংলার নিসর্গরূপ বর্ণিত হয়েছে গানটিতে। ১৯৩৫ শিল্পী ইন্দুসেন টুইন রেকর্ডস থেকে এই গানটি রেকর্ড করেন। নজরুল ইনস্টিটিউটকৃত 'নজরুল-সংগীত স্বরলিপি' বইটির একাদশ খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

লালনগীতি

তাল: দ্রুত দাদরা

সব লোকে কয়– লালন কি জাত এই সংসারে
লালন বলে, 'জাতির কি রূপ আমি দেখলাম না এক নজরে' ॥

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারী জাতির কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নী চিনি কিসেরে ॥

কেউ মালা কেউ তস্‌বী গলে,
তাইতে কি জাত্ ভিন্ন বলে,
আসা কিংবা যাবার কালে,
জাতির চিহ্ন রয় কারে ॥

জগত জুড়ে জাতির কথা,
জাতি গৌরব করে যথাতথা,
লালন বলে, জাতির ফাতা,
ডুবাইছি সাধ্ বাজারে ॥

II {-া -া গা | মা ধা -পা I মা গা -া | রা সা -া । I
০ ০ সব লো কে কয় লা ল ন্ কি জা ত্

I (-া পা মা | পা -মা -গা)}I পা -া মা | $^{\text{ধ}}$পা -$^{\text{প}}$মা -$^{\text{ম}}$গা I
০ সং সা রে ০ ০ সং ০ সা রে ০ ০

I -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্রগা র্রা -া | র্সরা র্সনা -া I
০ ০ লা লন ব লে জা০ তি র্ কি০ রূ০ প্

I -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্রগা র্রা -া | র্সরা র্সাঃ নঃ I
০ ০ লা লন ব লে জা০ তি র্ কি০ রূ০ ০

I র্সনা -া নর্সা | র্রা $^{\text{র্}}$র্সা না I ধনা র্সা না | নধা প -া II
০০ প্ দ্যাখ লাম না এর I ন০ ০ জ রে০ ০ ০

II -া -া গা | মা পা নধা I -ধার্সা -া র্সা | না নধা -পা I
০ ০ সুন্ নত্ দি লে০ হয় ০ মু সল্ মা০ ন্

I -া -া মা | মা গা রাঃ I সঃ $^{\text{স}}$পা পা | মা গা -া I
০ ০ না রী জা তি র কি হয় বি ধা ন

I -া -া পর্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্গা গর্রা | র্সর্রা র্সনা -া I
০ ০ বা মন চি নি পৈ ০০ তে০ প্র০ মা০ ণ

I -া -া নর্সা | না ধা পা I পমা -ধা পা | মাঃ গঃ -া I
০ ণ বাম্ নী চি নি কি০ ০ সে রে ০ ০

II{ -া -া গা | মা পা নাধা I ধার্সা -া র্সা | গর্না নধা পা I
০ ০ কেউ মা লা কেউ তস্ ০ বী গ লে০ ০

I -া -া মপা | মা গা রাঃ I সঃ পা পা | মা গা -া }I
০ ০ তাই তে কি জা ত্ ভিন্ ন ব লে ০

I -া -া পর্সা | র্সা র্সা র্সা I র্গা র্রা -া | র্সরা র্সনা -া I
০ ০ আসা র কিং বা যা০ বা র্ কা০ লে০ ০

I -া -া নর্সা | না ধা পা I পমা ধা পা | মা পা -া II
০ ০ জা০ তির চি হ্ন র০ য় কা রে ০ ০

II{ -া -া গা | মা পা নাঃ I ধঃ র্সা র্সা | না ধপা -া I
০ ০ জ গত জু ড়ে ০ জা তির্ ক থা০ ০

I -া -া মপা | মা গা গরা I -সা মপা পা | মা পা -া }I
০ ০ গৌ০ রব ক রে০ ০ য০ থা ত থা ০

I -া -া পর্সা | র্সা র্সা র্সা I র্গা র্রা র্রা | র্সর্রা র্সনা -া I
০ ০ লা ঙ্গন ব লে জা০ তি র্ ফা০ তা০ ০

I -া -া র্সর্সা | না ধা পা I পমা -ধা পা | মাঃ গঃ -া II II
০ ০ ডুবা ই ছি সাধ্ বা০ ০ জা রে ০ ০

লালনগীতি

তালঃ দাদরা

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশী নগর,
(সেথা এক ঘর) পড়শী বসত করে ॥
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
নাই কিনারা, নাই তরণী–পারে।
বাঞ্ছা করি দেখব তারে
কেমনে সেথা যাই রে ॥

কি বলব সেই পড়শীর কথা,
ও (তার) হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা,–নাই রে।
(ওসে) ক্ষণেক থাকে শূণ্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥

পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
যম যাতনা সকল যেতো, দুরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

(তাল ছাড়া)

সা	সা	সা	সা	রা	গা	গা	পা	পামা	মা	-া	-া	-া	-া	-া	পধা	ণা
বা	ড়ি	র্	কা	ছে	আ	র্	শী	ন০	গ	০	০	০	০	০	০০	০
ধা	পধা	পা	মপা	মা	গা	পা	পা	পা	ধা	-ধা	ণা	ধা	-া	পা	মপা	গা
০	০০	০	০০	০	র্	সেথা	এক	ঘর	প	ড়	শী	ব	০	সত্	ক০	রে

														সা	সা	
														আ	মি	
	+				০				+				০			
I	সা	-সা	রা	|	গা	পা	-া	I	-পধা	-ণা	-ধা	|	-পা	-মা	-গা	I
	এ	ক্	দি		ন	না	০		০০	০	০		০	০	০	

I -া -া পমা | গা রা -পা I গাঃ রসঃ সা | -া -া -া I
০ ০ দে০ খি লা ম্ তা রে০ ০ ০ ০ ০

|-া -া সা | সা সা রা I গা গা ^{ধ}পা | পমা মা -া I
০ ০ বা ড়ির্ কা ছে আ র্ শী ন০ গ র

| পধা ণধা পমা | গা পা পা I {ধা -া ণা | ধা পা -া I
০০ ০০ ০০ র্ এক্ ঘর্ প ড় শী ব স ত্

| মপা মগা পমা | -া (পা পা) I মগা রসা II
ক০ রে০ ০ ০ এক্ ঘর আ০ মি০

II -া -া সা | সা সা রা I রগা গা রা | রগা গপা -া I
০ ০ গে রাম্ বে ড়ে অ০ গা ধ্ পা০ নি০ ০

I পধা -া পা | মা গা -া I গমা গা রগাঃ | রঃ সা -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০

I -া -া সরা | রগা গপা পধা I ধাঃ পঃ ^{গ}মাঃ | গা রা রগা I
০ ০ নাই কি০ না০ রা০ না ই ত র ণী ০০

I গা রা সা | -া -া -া I {-া -া পা | ধা র্সা র্সা I
পা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ বান্ ছা ক রি

I না -া র্সা | না ধা -পা I (-পা -ধা -না | র্সা -না -ধা)} I
দে খ্ ব তা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I {ধা -া ণা {ধা পা -ধপা I মপা ধপা মা | (গা পা পা)} II
ক্যা ম্ নে সে থা ০০ যা০ ০ই রে ০ আ মি

I -া -া সা | সা সা রা I রগা গমা -গরা | রা গপা -া I
০ ০ কি বল্ ব পড় শী০ র০ ০০ ক থা০ ০

I ধধা ^{ধ}পা ^{প}মা | ^{ম}গা -া -া I গা গমা গা | রা মগা রা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ তা০ র্

I -া -া গপা | পধা ধণা ধপা I পধা পা গা | গা গরা সা I
০ ০ হস্ত০ প০ দ০ স্ক০ ন্ ধ মা থা০ ০

সা পা [র্রা]
I গা গরা সা | -া -া -া I {-া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I
নাই রে০ ০ ০ ০ ০ ও সে ক্ষ ণেক থা কে

I না র্সা র্সা | না ধা পা] I গা পা পা | -া ধর্সা না I
শু ০ ন্যের উ প র ক্ষ ণে ক্ ০ ভা০ সে

I ধনা ধপা -া | -া গা পা I গা পা পা | -া ধর্সা না I
নী০ রে০ ০ ০ ও সে ক্ষ ণে ক্ ০ ভা০ সে

I না নধাঃ পঃ | পধা পা মা I গা সরা সা | -া গা গা I
নী রে০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ এক্ ঘ্

I রা সা গা | পা রা গা I গা $^{\text{গ}}$রা $^{\text{স}}$সা | -া -সা সা I
০ র্ পড়ু শী ব সত ক রে ০ ০ আ মি

I -া -া ধ্সা | সা সা রা I রগা গা রা | রগা গপা -া I
০ ০ পড়ু শী য দি আ০ মা য় ছুঁ০ তো০ ০

I -া -া -া | ধধা পপা মমা I ম$_{\text{গা}}$ -া রা | গা পা ধা I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ যম্ যা ত না

I ধধা গপা মমা | মগা ররা সা I গা রা সঃ | -া -া -া I
স০ ক০ ০০ ল্ যে০ ত দূ রে ০ ০ ০ ০

I -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I -া -া না | র্সা না ধা I
০ ০ সে আর লা লন ০ ০ এক্ খা নে র

I পা -া র্র | র্সা র্সা র্সা I না -া র্সা | না ধা পা I
য় ০ সে আর লা লন এ ক্ খা নে র য়

I {গা পা পা | ধা না র্সনা I ধনা -া ধপা | -া -া -া} I
ল ০ ক্ষ যো জ ০ন ফাঁ০ ক্ রে০ ০ ০ ০

I পধা পা মপা | মা গা রসা II II
০০ ০ ০০ ০ আ মি০

হাসন রাজার গান

তাল: কাহারবা

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে
কান্দে হাসন রাজার মন মুনিয়ায় রে ॥

মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশির মাঝারে
লালে ধলায় হইলাম বন্দি পিঞ্জিরার ভিতরে রে ॥

উড়িয়া যায়রে ময়না পাখি পিঞ্জিরায় হইলো বন্দি
মায়ে বাপে লাগাইলা মায়া জালের আন্ধি রে ॥

পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট করে
এমন মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙ্গিতে না পারে রে ॥

উড়িয়া যাইব শুয়া পাখি পড়িয়া রইব কায়া
কিসের দেশ কিসের খেশ কিসের মায়া দয়া রে ॥

ময়নাকে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া রে ॥

হাসন রাজায় ডাকবো যখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়নায় আর কী ফিরিয়া চায় রে ॥

+ ০ + ০
II সা -া সা -গা | গা -া গা -মা I মা -পা পা -া | পা -া ধা -পা I
মা ০ টি ০ র ০ পি ন্ জি ০ রা র্ মা ০ ঝে ০

I -মা -া মা পা | -া ণা ণা ধা I ধা -পা -পা -মা | -মা -গা -গা -রসা I
০ ০ বন্ দী ০ হই য়া ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I সা গা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা -পা -ধা | পা -া মা -পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন্ মু নি য়া য়্ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণধা I
মা ০ য়ে ০ বা ০ পে ০ ব ন দী ০ ক ই লা ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
খু ০ শী ০ র ০ মা ০ ঝা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I গা পা ধা -া | পা -া ধা -া I
লা ০ লে ০ ধ০ ০ লা য় হ ই লা ম্ ব ন দী ০

I র্সা -া র্সা ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
পি ন্ জি ০ রা র্ ভি ০ ত ০ রে ০ রে ০ ০ ০

I সা -পা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা -পা -ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন্ মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্স -া -র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা -ণধা I
উ ড়ি য়া ০ যা য় রে ০ ম য় না ০ পা ০ খি ০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
পিন জি রা য় হ ই ল ০ ব ন দী ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
মা ০ য়ে ০ বা০ ০ পে ০ লা ০ গা ০ ই ০ লা ০

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা পা I পা -মা মা -গা | গা -া রা সা I
মা ০ য়া ০ জা ০ লে র আ ন্ ধি ০ রে ০ ০ ০

I সা -পা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা -পা -ধা | পা -া মা ধা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন্ মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা র্সা | র্সা -া র্স্য র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণধা I
পি ন্ জি ০ রা য় সা ০ মা ই য়া ০ ম য় না য়০

২০২৫

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
ছ ০ ট ০ ফ ০ ট ০ ক ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
এ ০ ম ০ ন০ ০ ম জ বু ০ ত ০ পিন্ জি রা ০

I ণর্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
ভা ০ ঙ্গি ০ তে ০ না ০ পা ০ রে ০ রে ০ ০ ০

I সা -পা গা -া | -া -া গা -মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা -পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা -ণা -ণা ণধা I
উ রি য়া য়া যা ই ব ০ শু ০ য়া ০ পা ০ খি ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
প ড়ি য়া ০ র ই ব ০ কা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
কি ০ সে র দে০ ০ শ ০ কি ০ সে র খে ০ শ ০

I রর্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া রা -সা I
কি ০ সে র মা ০ য়া ০ দ ০ য়া ০ রে ০ ০ ০

I সা -পা গা -া | -া -া গা মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা পা I
কা ন দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণধা I
ম য় না ০ কে ০ পা ০ লি ০ তে ০ আ ০ ছি ০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
দু ০ ধ ০ ক ০ লা ০ দি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
যা ই বা র কা ০ লে ০ নি ষ ঠু র ম য় না য়

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া পা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া রা -সা I
না ০ চা ই ব ০ ফি ০ রি ০ য়া ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা পা ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
ম ০ ০ ন মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা -পা পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণধা I
হা ০ ছ ন্ রা ০ জা য় ডা ক্ ব ০ য ০ খ ন০

I ধা -া ধা ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
ম য় না ০ আ য় রে ০ আ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
এ ০ ম ০ ন০ ০ নি ষ্ ঠু ০ র ০ ম য় না ০

I র্র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
আ র কি ০ ফি রি য়া ০ চা ০ ০ য় রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা মা I মা পা -পা -ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন মু নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

হাসন রাজার গান

তালঃ দ্রুত দাদরা

লোকে বলে, বলেরে,
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার ॥
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাক্‌না চুল আমার ॥
এ ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘর-দুয়ার না বান্দে।
কোথায় নিয়া রাখমু আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে ॥
হাসন রাজায় জানত যদি বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান কোঠা করিয়া রঙ্গিন ॥

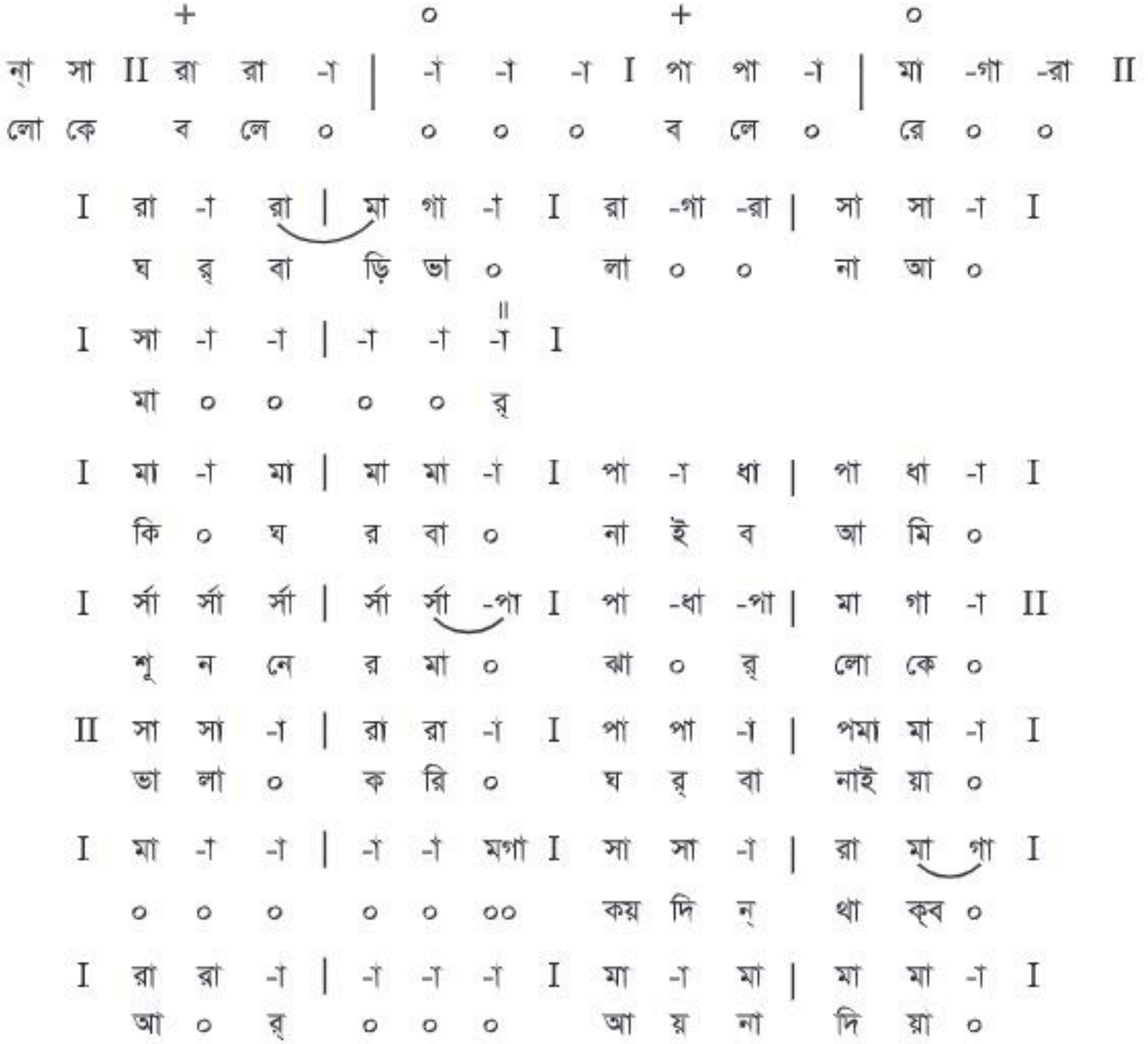
+ ০ + ০
ন্‌া সা II রা রা -া | -া -া -া I পা পা -া | মা -গা -রা II
লো কে ব লে ০ ০ ০ ০ ব লে ০ রে ০ ০
I রা -া রা | মা গা -া I রা -গা -রা | সা সা -া I
ঘ র্‌ বা ড়ি ভা ০ লা ০ ০ না আ ০
I সা -া -া | -া -া -া I
মা ০ ০ ০ ০ র্‌
I মা -া মা | মা মা -া I পা -া ধা | পা ধা -া I
কি ০ ঘ র বা ০ না ই ব আ মি ০
I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -পা I পা -ধা -পা | মা গা -া II
শূ ন নে র মা ০ ঝা ০ র্‌ লো কে ০
II সা সা -া | রা রা -া I পা পা -া | পমা মা -া I
ভা লা ০ ক রি ০ ঘ র্‌ বা নাই য়া ০
I মা -া -া | -া -া মগা I সা সা -া | রা মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ কয় দি ন্‌ থা ক্‌ব ০
I রা রা -া | -া -া -া I মা -া মা | মা মা -া I
আ ০ র্‌ ০ ০ ০ আ য় না দি য়া ০

| পা -া পা | পা ধা -া |I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা পা I
চা ই য়া দে খি ০ পা ক্ না চুল আ ০

I পা -ধা -পা | মা পা -া II
মা ০ র লো কে ০

II সা সা -া | রা রা -া I পা পা -া | পমা মা -া I
এ ই ভা বি য়া ০ হা স ন্ রা০ জা ০

I -মা -া -া | -া -া মগা I সা সা -া | রা মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ য়০ ঘর্ দু য়া র না ০

I রা রা -া | -া -া -া I মা মা -া | মা মা -া I
বান্ ধে ০ ০ ০ ০ কো থা য়্ নি য়া ০

I পা -া পা | পা ধা -া I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -পা I
রা খ ব আ ল্লা য় এর লা ০ গি য়া ০

I পা -ধা -পা | মা গা -া II
কা ন দে লো কে ০

II সা সা -া | রা রা -া I পা পা -া | পমা মা -া I
হা স ন্ রা জা য় বু ঝ তো য০ দি ০

I -মা -া -া | -া -া মগা I সা সা -া | রা মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ বাঁ চ্ ব ক ত ০

I রা রা -া | -া -া -া I মা মা -া | মা মা -া I
দি ন্ ০ ০ ০ ০ বা না ০ ই ত ০

I পা পা পা | পা ধা -া I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -পা I
দা লা ন কো ঠা ০ ক রি ০ য়া র ০

I পা -ধা -পা | মা গা -া II II
গি ০ ন লো কে ০

পল্লিগীতি

কথা ও সুরঃ সিরাজুল ইসলাম
তালঃ কাহারবা

হলুদিয়া পাখি সোনারি বরণ
পাখিটি ছাড়িলো কে
কেউ না জানিলো কেউ না দেখিলো
কেমনে পাখি দিয়া যে ফাঁকি
উইড়া গেল হায় চোখের পলকে ॥
সোনার পিঞ্জিরা শূন্য করিয়া
কোন বনে পাখি গেল যে উড়িয়া
পিঞ্জিরার জোড়া খুলিয়া খুলিয়া,
ভাইঙ্গা পড়ে সেইনা পাখির শোকে ॥
সবি যদি ভুলে যাবিরে পাখি,
কেন তবে হায় দিলিরে আশা।
উইড়া যদি যাবি ওরে ও পাখি,
কেন বাইন্ধাছিলি বুকেতে বাসা।
কতনা মধুর গান শুনাইয়া
গেলিরে শেষে কেন কান্দাইয়া
তোমারে স্মরিয়া দুখের দরিয়া
উথলি ওঠে হায় স্বজনের চোখে ॥

II -া রমা গা মা | পা -া ধণা -পধা I -া ধর্সা র্সা র্সর্রর্সা | ণা -ধা পধপা -মা I
০ হলু দি য়া পা ০ খি০ ০০ ০ সো০ না রি০০ ব ০ র০০ ণ্

I -া রমা মা গমা | রমা -গরা সা ন্া I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
০ পা০ খি টি০ ছা০ ০০ ড়ি লো কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I -া রমা মা গমা | রগা গা গরা -া I -া রমা মা গমা | রগা গা রসা -া I
০ কে০ উ না০ জা নি লো০ ০ ০ কে০ উ না০ দে০ খি লো ০

I -া রমা গা মা | পা -া ধণা -পধা I -া ধর্সা র্সা র্সর্রর্সা | ণা -ধা পধপা -মা II
০ কে০ ম নে পা ০ খি০ ০০ ০ দি০ য়া যে০০ ফাঁ ০ কি০০ ০

I -া পর্সা -র্সা র্সর্রর্সা | ণা ধা পধপা -মা I পা পণা ধণা পদা | মপা -গমা -রগা -সরা I
০ উ০ ই ড়া০০ গে ল হা০০ য় চো খের্ প০ ল০ কে০ ০০ ০০ ০০

I -া রমা মা গমা | রমা -গরা সা ন্া I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
০ পাঁ০ খি টি০ ছাঁ০ ০০ ড়ি লো কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I -া রমা গা মা | পা -া ধণা পধা I ধর্সা -া -া র্সর্রর্সা | ণা -ধণধা পধপা -মা II
০ পাঁ০ খি টি ছা ০ ড়ি ল কে০ ০ ০ রে০০ আ ০০০ মাঁ০০ র্

I -া রমা মা গমা | রমা -গরা সা ন্া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
০ পাঁ০ খি টি০ ছাঁ০ ০০ ড়ি ল কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

II -া ধর্সা র্সা র্রা | র্রা র্রা র্গর্রা -র্সা I -র্সা র্সা -র্রা র্রর্মা | র্গর্মর্গা র্গর্মা র্রা -া I
০ সোঁ০ না র পিন্ জি রাঁ০ ০ ০ শূ ন্ ণ্য০ ক০০ রি০ য়া ০

I -া র্সা র্সা র্রা | র্রা -া র্রর্গা -র্রর্গা I -র্সা র্সা র্রা -র্রর্গা | $^{\text{র্স}}$র্রা র্সা র্সা -া I
০ কোন্ ব নে পা ০ খি০ ০০ ০ গে ল যে০ উ ড়ি য়া ০

I {-া ধনা না র্সা | র্সা -া নর্সা -র্রর্সা I -না নর্সা না ধপা | ধনা না নর্সা -ধনা} I
০ পিন্ জি রার্ জো ০ ড়াঁ০ ০০ ০ খু লি য়াঁ০ খু লি য়াঁ০ ০০

I -া নর্সা র্সা র্সর্রর্সা | ণা ধা পধপা মা I পা পণা ধণা পধা | মপা -গমা -রগা -সরা I
০ ভাঁ০ ই ঙ্গাঁ০০ প ড়ে সে০ই না পা খি০ র০ শোঁ০ কে০ ০০ ০০ ০০

I -া রমা মা গমা | রমা -গরা সা ন্া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
০ পাঁ০ খি টি০ ছাঁ০ ০০ ড়ি ল কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া রমা মা মা | মা -া মা গমগা I -া রা গা মা | $^{\text{ম}}$গা -া রা -া I
০ স০ বি য দি ০ ভু০ লে০০ ০ যা বি রে পা ০ খি ০

I -া গরা রা -মা | পা -ধা পধা র্সণা I -া পধা ধা ণা | $^{\text{প}}$ধা -পা পা -া I
০ কে০ ন ত বে ০ হাঁ০ ০য় ০ দি০ লি রে আ ০ শা ০

I -া পধা ধা ধা | ধা ধা ণা ধণধা I -পা পণা ধণা পধপা | মা -গমগা রা -া I
০ উঁ০ ই ড়া য দি যা বি০০ ০ ও০ রে০ ও০০ পা ০০০ খি ০

I -া সা রগা গা | গা -মা পা পধপা I -মগা গা মা পা | পা -া পা -া I
০ কে ন০ বাইন্ ধা ০ ছি লি০০ ০০ বু কে তে বা ০ সা ০

II -া ধর্সা র্সা র্রা | র্রা -া র্গর্রা -র্সর্রা I -র্সা র্সা -র্রা র্রর্মা | র্গর্মর্গা -র্রা র্রা -া I
০ ক০ ত না ম ০ ধু০০ ০০ র্ গা ন্ শু০ না০০ ই য়া ০

I -া র্সা র্সা র্রা | র্রা -া র্রর্গা -র্রর্গা I -র্সা র্সা র্রা র্রর্গা | ${}^{\text{র্গ}}$র্রা -র্সা র্সা -া I
০ গে লি রে শে ০ যে০ ০০ ০ কো ন কান্ দা ই য়া ০

I -া ধনা না র্সা | র্সা র্সা নর্সা -র্রর্সা I -না নর্সা না ধপা | ধনা না নর্সা -ধনা I
০ তো০ মা রে স্ম রি য়া০ ০০ ০ দু০ খে র০ দ০ রি য়া০ ০০

I -া ধনা না র্সা | র্সা র্সা নর্সা -র্রর্সা I -না নর্সা না ধপা | ধনা না নর্সা -ধনা I
০ তো০ মা রে স্ম রি য়া০ ০০ ০ দু০ খে র০ দ০ রি য়া০ ০০

I -া নর্সা র্সা র্সর্রর্সা | ণা ধা পধপা -মা I পা পণা ধণা পধা | মপা -গমা -রগা -সরা I
০ উ০ থ লি০০ ও ঠে হা০০ ০০ স জ০ নের্ চো০ খে০ ০০ ০০ ০০

I -া রমা মা গমা | রমা -গরা সা ন্া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
০ পা০ খি টি০ ছা০ ০০ ড়ি ল কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান

কথা ও সুর: মলয় ঘোষ দস্তিদার

তাল: কাহারবা

ছোডো ছোডো ঢেউ তুলি (পানিত্)
ছোডো ছোডো ঢেউ তুলি
লুসাই পাহাড় উত্তুন্ লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলি ॥

এ কূলো দি শহর বন্দর নগর কত আছে
আর এক্ কূলত্ সবুজ রোয়ার মাথত্
সোনালী ধান হাসে
গাছের তলাত্ মল্কা বানুর গান্
গুরা পোয়া গায় পরান্ খুলি ॥

কতনা গিরস্তের বউ ঝি পানি নিত যায়
কত পাখি গাছের আগত্ বই
কত গন্ হুনায়
হাল্দা ফাডা গন্ হুনাইয়ারে
সাম্পান যার গৈ পাল তুলি ॥

পাহাড়ী কন্ সুন্দরী মাইয়া ঢেউয়ের পানিত্ যাই
সেয়ান্ করি উডি দেখের্ কানর ফুল্ তার নাই
যেইদিন কানর ফুল হাঁজাইয়ে
হেইদিন উত্তুন্ নাম কর্ণফুলি ॥

II সা গা -া গা | গা -া গা -া I -া গা পা মা | গা মা গা -রা I
ছো ০ ০ ডো ছো ০ ডো ০ ০ ঢে উ তু লি ০ পা নিত্

I সা গা -া গা | গা -া গা -া I -া গা -া মা | গা রা সা -া I
ছো ০ ০ ডো ছো ০ ডো ০ ০ ঢে উ তু লি ০ ০ ০

I -া -া পা পা | -া পা গা -া I গা -া গা মা | গা পা মা গা I
০ ০ লু সা ই পা হা ড় উ ০ ত্তু ন লা মি য়া রে

I রা গা মা গা | রসা -া সা -া I সা -া -া -া | সা -া -া -া II
যা র গৈ ০ ক০ র্ ণ ০ ফু ০ ০ ০ লী ০ ০ ০

II -া -া সা সা | গা গা গা মা I মা পা পা মা | মা গা রা সা I
০ ০ এ কূ ল দি শ ০ হ ০ র ব ন ০ দ র

২০২৫

I -া -া সা র্সা | -গা গা গা মা I মা -া মা -া | -া -া মা পা I
০ ০ ন গ র্ ক ত ০ আ ০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

I মা গা -া -া | -া -া -া -া I -া -া -গা -মা | -া পা মা -গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আর এক ০ কু ল ত্

I গা -া গা -মা | গা -পা মা -গা I রা গা মা গা | রসা -া সা -া I
স ০ বু জ্ রো য়ার্ মা থত্ সো ০ না ০ লী০ ০ ধা ন্

I সা -া সা -া | -া -া -া -া I -া -া না না | -া না র্সনধা -না I
হা ০ সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ছে র ত লা০০ য়্

I -া না -া র্সা | না -র্রা র্সা -না I ধপা ধা -া ধা | ধা না র্সা না I
০ ম ল্ কা বা নুর্ গা ন্ গু০ রা ০ পো য়া ০ গা য়্

I ধপা পা -া পা | মগরা গা -া -া I -া -া পা পা | -া পা গা -া I
প০ রা ন্ খু লি০০ ০ ০ ০ ০ ০ লু সা ই পা হা ড়

I গা -া গা -মা | গা পা মা গা I রা -গা মা গা | রসা -া সা -া I
উ ০ ত্তু ন্ লা মি য়া ০ যা র গৈ ০ ক০ র্ ণ ০

I সা -া -া -া | সা -া -া -া II
ফু ০ ০ ০ লী ০ ০ ০

II -া -া সা র্সা | গা গা গা মা I মা -পা পা -মা | মা গা রা সা I
০ ০ ক ত ০ না গি ০ র স্ তে র্ ব উ ঝি ০

I -া -া সা র্সা | গা গা গা মা I মা -া -া -া | -া -া মা পা I
০ ০ পা নি নি ০ ত ০ যা য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা গা -া -া | -া -া -া -া I -া -া গা মা | -া পা মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক ত ০ পা খি ০

I গা -া গা -মা | গা -পা মা গা I রা গা মা গা | রসা -া সা -া I
গা ০ ছে র আ গত্ ব ই ক ০ ত ০ গ০ ন্ হ ০

I সা -া সা -া | -া -া -া -া I -া -া না না | -া না র্সনধা -না I
না য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হাল্ দা ০ ফা ডা ০

I ধপা -া -া পা | মগরা গা -া -া I -া -া পা পা | -া পা গা -া I
পা০ ল্ ০ তু লি০০ ০ ০ ০ ০ ০ লু সা ই পা হা ড়্

I গা -া মা -মা | গা পা মা গা I রা -গা মা গা | রসা -া সা -া I
উ ০ তু ন্ লা মি য়া রে যা র্ গৈ ০ ক০ র্ ণ ০

I সা -া -া -া | সা -া -া -া II
ফু ০ ০ ০ লী ০ ০ ০

II -া -া সা সা | গা গা গা -মা I মা -পা পা মা | মা গা রা সা I
০ ০ পা হা ০ ড়ী ক ন্ সু ন্ দ রী মা ই য়া ০

I -া -া সা সা | গা গা গা -মা I মা -া -া -া | -া -া মা পা I
০ ০ ঢে উ এর্ পা নি ত্ যা ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা গা -া -া | -া -া -া -া I -া -া গা মা | -া পা মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে য়া ন্ ক রি ০

I গা -া গা -মা | গা পা মা গা I রা -গা মা গা | রসা -া সা -া I
উ ০ ডি ০ দে ০ খে র্ কা ০ ন র্ ফু০ ল্ তা র্

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া না না | -া না সনধা -না I
না ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যেই দি ন্ কা ন০ র্

I -া মা -া র্সা | না র্রা র্সা না I ধপা -ধা -া ধা | ধা না -র্সা -না I
০ ফু ল হাঁ জা ই য়ে ০ হে০ দিন্ ০ উ তু ন না ম্

I ধপা -া -া পা | ধা পা মগা -া I -া -া পা পা | -া পা গা -া I
ক০ র্ ০ ণ ফু ০ লী০ ০ ০ ০ লু সা ই পা হা ড়্

I গা -া গা -মা | গা পা মা গা I রা -গা মা গা | রসা -া সা -া I
উ ০ তু ন্ লা মি য়া রে যা র্ গৈ ০ ক০ র্ ণ ০

I সা -া -া -া | সা -া -া -া II II
ফু ০ ০ ০ লী ০ ০ ০

[শব্দার্থ: পাহাড় উত্তুন্– পাহাড় থেকে, যার গৈ– বেয়ে চলেছে, এ কুলোদি– এই কুলে, গুরা পোয়া– ছোট ছেলে, হালদা ফাডা– চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের গান, ফুল হাঁজাইয়ে– ফুল হারাইয়া, গন্ হুনায়– গান শোনায়।]

দেশাত্মবোধক গান

কথা: নজরুল ইসলাম বাবু
সুর: আলাউদ্দিন আলী
তাল: দাদরা

আমায় গেঁথে দাওনা মাগো
একটা পলাশ ফুলের মালা,
আমি জনম জনম রাখব ধরে
ভাই হারানোর জ্বালা ॥

আসি বলে আমায় ফেলে সেই যে গেল ভাই
তিন ভুবনের কোথায় গেলে ভাইয়ের দেখা পাই
দেব তারি সমাধিতে আমি তোমার হাতের মালা
ভাই হারানোর জ্বালা ॥

তারি শোকে কোকিল ডাকে ফোটে বনের ফুল
ফুল ফাগুনের মধুর তিথি কেঁদে হয় আকুল
আজোও তারি স্মরণ করে সবাই সাজাই ফুলের ডালা
ভাই হারানোর জ্বালা ॥

						ধর্সা	র্সা	II	র্সা	র্সা	-া	|	র্সনা	ধপা	-গা	I
						আ০	মায়		গেঁ	থে	০		দাও	না০	০	
I	পা	না	-া	|	-া	ধনা	ধা	I	পধা	পা	-া	|	পা	পরা	-মা	I
	মা	গো	০		০	এক	টা		প	লা	শ্		ফু	লে০	র্	
I	মপমা	গা	-া	|	-া	ধর্সা	র্সা	I	র্সা	র্সা	-া	|	র্সনা	ধপা	-গা	I
	মা০০	লা	০		০	আ০	মায়		গেঁ	থে	০		দাও	না০	০	
I	পা	না	-া	|	-া	ধনা	ধা	I	পধা	পা	-া	|	পা	পরা	-মা	I
	মা	গো	০		০	এক	টা		প	লা	শ		ফু	লে০	র্	
I	মপমা	গা	-া	|	-া	সা	রা	I	গা	গপা	-া	|	পক্ষা	পক্ষা	-ধা	I
	মা০০	লা	০		০	আ	মি		জ	ন০	ম		জ০	ন০	০	
I	-া	-া	পগা	|	গা	রসা	সগা	I	-রা	-া	রন্া	|	রা	রমা	গরা	I
	০	০	রাখ্		ব	ধ	রে০		০	০	ভাই		হা	রা	নোর্	

I	সন্া	$^{\text{র}}$সা	-া	|	-া	ধর্সা	র্সা	I	র্সা	র্সা	-া	|	র্সনা	ধপা	-গা	I
	জ্বা০	লা০	০		০	আ০	মায়		গেঁ	থে	০		দাও	না	০	
I	পা	না	-া	|	-া	ধনা	ধা	I	$^{\text{প}}$ধা	পা	-া	|	পা	পরা	-মা	I
	মা	গো	০		০	এক্	টা		প	লা	শ		ফু	লে০	র্	
I	মপমা	গা	-া	|	-া	-া	-া	II								
	মা০০	লা	০		০	০	০									
								II	-া	-া	গা	|	পধপা	গা	রসা	I
									০	০	আ		সি০০	ব	লে০	
I	সা	রসা	-ধা	|	ধা	ধা	-া	I	-া	-া	ধর্সা	|	না	$^{\text{প}}$ধা	পা	I
	আ	মা০	য়্		ফে	লে	০		০	০	সেই		যে	গে০	ল	
I	পা	-ণা	-া	|	-ধা	-পা	-মা	I	-গা	-া	গা	|	পধপা	গা	রসা	I
	ভা	০	০		০	০	০		০	ই	তিন		ভু০০	ব	নের্	
I	সা	রসা	-ধা	|	ধা	ধা	-া	I	-া	-া	ধর্সা	|	না	$^{\text{প}}$ধা	পা	I
	কো	থা০	য়		গে	লে	০		০	০	ভাই		য়ের	দে০	খা	
I	পা	-া	-া	|	-া	-া	পা	I	-া	-া	-া	|	-া	ধনা	না	I
	পা	০	০		০	০	ই		০	০	০		০	দে০	ব	
I	-া	-া	না	|	র্সা	র্রর্গর্রা	র্সনা	I	র্সা	র্সা	-র্রর্সা	|	ণধা	পমা	-া	I
	০	০	তা		রি	স০০	মা০		ধি	তে	০০		আ০	মি০	০	
I	-া	-া	রমা	|	মা	গা	রসা	I	সা	$^{\text{গ}}$রা	-া	|	-া	-া	-া	I
	০	০	তো০		মার্	হা	তের্		মা	লা০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-রন্া	|	রা	রমা	গরা	I	সন্া	$^{\text{র}}$সা	-া	|	-া	ধর্সা	র্সা	II
	০	০	ভাই		হা	রা০	নোর		জ্বা০	লা০	০		০	আ০	মায়	

গেঁথে দাওনা মাগো ... . মালা।

পরবর্তী অন্তরা প্রথম অন্তরার মতো একই সুরে রচিত।

দেশাত্মবোধক গান

গীতিকার: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সুরকার: আবদুল আহাদ
তাল: দাদরা

আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারা মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া-যে
নেই কিছু প্রয়োজন ॥

প্রাণে প্রাণে যেন তাই
তারি সুর শুধু পাই
দিগন্ত জুড়ে সোনা রং ছবি
এঁকে যাই সারাক্ষণ ॥

বাতাসে আমার সবুজ স্বপ্ন দুলছে
কণ্ঠে কণ্ঠে তারই ধ্বনি শুধু তুলছে।
গানে গানে আজি তাই
সেই কথা বলে যাই
নতুন আশার এনেছি জীবনে
সূর্যের এ লগন ॥

	+				০				+				০			
II	{সা	গা	পা	|	র্সা	র্সা	র্সানা	I	না	র্সনা	নধা	|	ধা	না	ধা	I
	আ	মা	র		দে	শে	র০		মা	টি০	র০		গ	ন	ধে	
|	গা	গনা	নধা	|	ধগা	গা	গপা	I	পা	-মা	-া	|	-া	-া	-া	I
	ভ	রে০	আ০		ছে০	সা	রা০		ম	০	০		০	০	ন	
|	রা	গা	মা	|	ধাপা	পা	পসা	I	সা	রা	গা	|	পমা	মা	মা	I
	শ্যা	ম	ল		কো০	ম	ল০		প	র	শ		ছা০	ড়া	যে	
I	ধ্‌া	ন্‌া	সা	|	রা	গা	রা	I								
	নে	ই	কি		ছু	প্র	য়ো									
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া}	II								
	জ	০	০		০	০	ন									

II { পা ধা না | র্সা র্সর্গা র্রা I র্সনা -র্রর্সা -া | -া -া -ধা I
প্রা ণে প্রা ণে যে০ ন তা ০০ ০ ০ ০ ই

I ধা না র্সনা | র্সা র্সা ধা I
তা রি সু০ য় শু ধু

I পক্ষা ধপা গা | -া -া -া } I
পা০ ০০ ০ ০ ০ ই

I পা পধা -র্সণা | ধপা পা পা I ক্ষা পা পক্ষা | ধপা মা গা I
দি গ ন্ ত০ জু ড়ে সো না র০ ০ঙ্ ছ বি

I রা গা মা | -ধপা রা রসা I
এঁ কে যা ০ই সা রা

I সা -া -া | -া -া -া II
ক্ষ ০ ০ ০ ০ ণ্

II {সা গা ক্ষা | পা -া ক্ষা I পাধা ধ -পা | ধা -না ধা I
বা তা সে আ মা র স০ বু জ স্ব প্ ন

I নর্রা র্সর্রা না | ০ -া -া I না র্সনা নধা | ধা -া ধা I
দু০ ০ল্ ছে ০ ০ ০ ক ০ন্ ঠে০ ক ন্ ঠে

I দা ধা ধনা | নগা গা গা I গা -া গা | -া -া -া I
তা রি ধ্ব০ নি০ শু ধু তু ল্ ছে ০ ০ ০

I {পা ধা না | র্সা র্সর্গা র্রা I
গা নে ০ নে আ০ জি

I র্সনা র্রর্সা -া | -া -া -া I ধা না র্সনা | র্রা র্সা ধা I
তা০ ০০ ০ ০ ০ ই সে ই ক০ থা ব লে

I পক্ষা -ধাপা -গা | -া -া -া} I {পা পধা র্সণা | ধপা পা -া I
যা০ ০০ ০ ০ ০ ই ন তু০ ন্ আ০ শা র্

I	ক্ষা	পা	-া	|	ধা	-া	-া	I	ঋা	ঋা	-া	|	-া	-া	-া	I
	এ	নে	০		ছি	০	০		জী	ব	নে		০	০	০	
I	ঋা	গা	মা	|	ধপা	-া	-া	I	ঋা	ঋা	-া	|	সা	-া	-া	I
	সু	০	র্যে		র	০	০		এ	ল	০		গ	০	০	
I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া}	II II								
	০	০	০		০	০	ন									

দেশাত্মবোধক গান

গীতিকার ও সুরকার: আবদুল লতিফ
তাল: কাহারবা

ও আমার দেশের মাটিরে
ও আমার দেশের মাটিরে
তুই যে আমার সাত রাজার ধন
সোনার খাঁটিরে, সোনা খাঁটিরে ॥

ও... ও... রে
তুই যে আমার স্বপ্ন আশা,
স্বপ্ন আশারে
তুই যে আমার ভালবাসা,
ভালবাসারে

তুই যে আমার ক্ষুৎ পিপাসায় দুধের বাটিরে
দুধের বাটিরে ॥

তোর বনে যে দোয়েল কোয়েল হাজার পাখির গান।
বটের ছায়া শীতল বাতাস জুড়ায় আমার প্রাণ।

ও... ও... রে
তুই যে আমার জীবন মরণ জীবন মরণ রে
তুই যে আমার দুঃখ হরণ দুঃখ হরণ রে
তোরই বুকে বিছাই সুখের শীতল পাটিরে
শীতল পাটিরে ॥

I -া -া -না ধা পা পা ধপা -মা I মা -া মা -গা | রা -সা রা ᵐজ্ঞা I
০ ০ ও আ ০ ০ মা০ র্ দে ০ শে র্ মা ০ টি ০

I রা -া -া জ্ঞা | রা সা ণা -ধা I ণা -সা সা -া | রা -জ্ঞা সা -রা I
রে ০ ০ ও আ ০ মা র দে ০ শে র্ মা ০ টি ০

I মা -া -া -া | -া -া -া} -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -রা -মা মা | মা -া মা -া I মা -পা পা -মা | পা -ধা ধা -া I
তু ০ ই যে আ ০ মা র্ সা ত্ রা ০ জা র্ ধ ন্

২০২১

I র্ধা -র্সা র্সা -র্রর্সা | ণা -া ধা -ণধা I পধা -পা -া -া | -া -া -া -া I
সো ০ না ০০ খাঁ ০ টি ০০ রেঁ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া সর্ণা -ধা | পা মা পধা -মা I মা -া -া ধা | ধা -পা ধপা -মা I
সো ০ না০ ০ খাঁ ০ টি০ ০ রে ০ ০ ও আ ০ মা০ র

I র্সা -া -া -া | -া -া -া -রা I ণা -র্রা র্সা -ণা | ধা -পা -ধপা -মা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া -া -র্সা | র্সা -া র্রা -র I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা র্

I ণা -র্রা র্সা -ণা | ধা -া ধপা -মা I সা -রা সা -ধা | ধা -পা ধপা -মা I
স্ব প্ নো ০ আ ০ শা০ ০ স্ব প্ নো ০ আ ০ শা০ ০

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া -া -র্সা | র্সা -া র্রা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা র্

I ণা -র্রা র্সা -ণা | ধা -া ধপা -মা I সা -রা সা -ধা | ধা -পা ধপা -মা I
ভা ০ লো ০ বা ০ সা০ ০ ভা ০ লো ০ বা ০ সা০ ০

I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I ধা -া -ণা ণা | ণা -া ণা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা র্

I র্সা -র্রা র্রা র্সর্রা | র্সা -া ণা -া I র্সা -র্রা র্রা -র্সা | র্সা র্রর্সা না র্সনা I
ক্ষু ৎ পি ০ পা ০ সা য় দু ০ ধে র্ বা ০ টি ০

I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I ধা -া র্সণা -ধা | পা -মা ধপা -মা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দু ০ ধে র্ বা ০ টি ০

I মা -া -া ধা | ধা -পা ধপা -মা II
রে ০ ০ ও আ ০ মা র্

II গা -া -া মা | রা -গা সা -রা I ণ্া -রা সা -রা | ণ্া সা ধ্া -ণ্া I
তো ০ র্ ব নে ০ যে ০ দো ০ য়ে ল্ কো ০ য়ে ল

I সা -গা গা -া | মা -া ধা -পা I ধপা -মা -া -া | -া -া -া -া I
হা ০ জা র্ পা ০ খি র্ গা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I মা -ধা ধা -া | ণা -া ণা -র্সা I ধা -র্সা ণা -ধা | ধা -পা ধপা -মা I
ব ০ টে র্ ছা ০ য়া য়্ শী ০ ত ল্ বা ০ তা০ স্

I ধা -া র্সণা -ধা | পা -মা ধপা -মা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
জু ০ ড়া০ য়্ আ ০ মা০ র্০ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া -া র্সা | র্সা -া র্রা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা র্

I ণা -র্রা সাঁ ণা | ধা -পা ধপা -মা I সা -রা সা -ধা | ধা -পা ধপা -মা I
জী ০ ব ন্ ম ০ র০ ণ জী ০ ব ন্ ম ০ র০ ণ

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া -া র্সা | র্সা -া র্রা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই যে আ ০ মা র্

I ণা -র্রা সাঁ ণা | ধা -পা ধপা -মা I সা -রা সা -ধা | ধা -পা ধপা -মা I
দু ক খ্ ০ হ ০ র০ ণ্ দু ক্ খ ০ হ ০ র০ ণ্

I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I ধা -া ণা -া | ণা -া ণা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ রি ০ বু ০ কে ০

I র্সা -র্রা র্রা র্সর্রা | র্সা -া ণা -া I সাঁ -র্রা -রা -র্সা | র্সা র্সর্রা না ননা I
বি ০ ছা ই সু ০ খে র্ শী ০ ত ল পা ০ টি ০

I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I ধা -া র্সণা -ধা | পা -মা ধপা -মা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শী ০ ত ল্ পা ০ টি০ ০

I মা -া -া ধা | ধা -পা ধপা -মা II II
রে ০ ০ ০ আ ০ মা০ র্

দেশাত্মবোধক গান

গীতিকার: গোবিন্দ হালদার
সুরকার: আপেল মাহমুদ
তাল: দ্রুত দাদ্‌রা

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥
যে-মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে দেশের নীল অম্বরে মন মেলছে পাখা
সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ ভরি ॥
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা এক খানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি ;
নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি ॥
যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে
যে গৃহ কপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি ॥

													-া	দ্া	ণ্া	I
													০	মো	রা	
	+				০				+				০			
II	{ণ্া	-া	সা	|	সা	সা	সা	I	ঋা	জ্ঞা	ঋা	|	-সা	ঋস	ণ্া	I
	এ	ক্	টি		ফু	ল	কে		বাঁ	চা	বো		০	ব	লে	
I	ণ্া	ণ্া	সা	|	সা	সা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	সা	সা	I
	যু	দ্	ধ		ক	রি	০		০	০	০		০	মো	রা	
I	মা	-মা	মা	|	মা	মা	-া	I	মা	মা	-মা	|	জ্ঞা	সা	সা	I
	এ	ক্	টি		মু	খে	র্		হা	সি	র্		জ০	ন্	ন্য	

I পা পা পা | পা পা -া I -া -া -া | -া দ্া ণ্া I
অ স ত্র ধ রি ০ ০ ০ ০ ০ মো রা

I ণ্া -সা সা | সা সা সা I ঋা পা মা | -া ঋা সা I
এ ক্ টি ফু ল কে বাঁ চা বো ০ ব লে

I ণ্া ণ্া সা | সা সা -া I -া -া -া | -া -া ‖-া II
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {মা পা পা | -া পা পা I দা ণা ণা | দা পা -মা I
যে মা টি র্ চি র ম ম তা আ মা র্

I মা পা পা | পা পা -া I -া -া -া | -া -া -া I
অ ং গে মা খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞা -পা ধা | ধা ধা ধা I ধা ণা ণা | ধা ণা -া I
যা র্ ন দী জ লে ফু লে ফ লে মো র্

I ধা -ধা ণা | ধা র্সণা -া I -া -া সর্ণা | -দপা -মজ্ঞা -া I
স্ব প্ ন আঁ কা০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০

I পা ণা র্রা | -া র্রা র্রা I র্রা র্রা র্রা | -া র্রা -র্সা I
যে দে শে র্ নী ল অ ম ব রে মো ন্

I র্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I -া -া -া | -া -া -া I
মে ল্ ছে পা খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্সা -পা I পা পা পা | -মা জ্ঞা রা I
সা রা টি জ ন ম্ সে মা টি র্ দা নে

I ণ্া -ণ্া সা | সা সা -া I -া -া -া | -া দ্া ণ্া I
ব ক্ ক্ষ ভ রি ০ ০ ০ ০ ০ মো রা

I ণ্া -া সা | সা সা সা I ঋা জ্ঞা ঋা | -সা সা ণা I
এ ক্ টি ফু ল কে বাঁ চা বো ০ ব লে

I ণ্া ণ্া সা | সা সা -া I -া -া -া | -া -া -া II
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া দ্া ণ্া I
০ মো রা

II ণ্া ণ্া -সা | সা সা সা I সা সা সা | সা -া ণ্া I
ন তু ন্ এ ক টি ক বি তা লি খ তে

I ঋা -া ঋা | ঋা ঋা -া I -া -া -া | -া ঋা ঋা I
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ মো রা

I ঋা ঋা ঋা | ঋা ঋা ঋা I ঋা ঋা -া | ঋা ঋা সা I
ন তু ন এ ক টি গা নে র জ ন ন্য

I জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I -া -া -া | -া সা জ্ঞা I
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ মো রা

I পা -া পা | পা পা পা I পা পা পা | পা -া মা I
এ ক্ খা না ভা ল ছ বি র জ ন ন্য

I দা দা দা | দা দা -া I -া -া -া | -া মা দা I
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ মো রা

I র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা ণা I
সা রা বি শ্ শে র শা ন তি বাঁ চা তে

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I -া -া -া | -া -া -া I
আ জ কে ল ড়ি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণ্া ণ্া সা | সা সা সা I ঋা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা সা I
ন তু ন এ ক টি ক বি তা লি খ তে

I ণ্া ণ্া সা | সা সা -া I -া -া -া | -া -া -া I
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণ্া ণ্া সা | সা সা সা I ঋা ঋা জ্ঞা | ঋা ঋা সা I
ন তু ন এ ক টি গা নে র জ ন ন্য

I ণ্া ণ্া সা | সা সা -া I -া -া -া | -া -া -া II
যু দ্ ধ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {মা পা পা | -া পা পা I দা ণা ণা | দা পা -মা I
যে না রী র ম ধু প্রে মে তে আ মা র্

I মা পা পা | পা পা -া I -া -া -া | -া -া -া I
র ক্ ত দো লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I (জ্ঞা পা ধা | -া ধা ধা I ধা ণা ণা | ধা ণা -া I
যে শি শু র্ মা য়া হা সি তে আ মা র্

I ধা -ধা ণা | ধা র্সণা -া I -া -া র্সণা | -দপা মজ্ঞা -া)} I
বি শ্ শ ভো লে০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০

I পা ণা র্রা | র্রা র্রা -র্রা I র্রা -র্রা র্রা | -র্রা র্রা র্সা I
যে গৃ হ ক পো ত্ সু খ্ স্ব র্ গে র্

I র্রা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা | র্রা ^{র}র্জ্ঞা -া I -া -া -া | -া -া -া I
দু য়া র খো লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্সা পা I পা পা -মা | জ্ঞা রা রা I
সে ই শা ন্ তি র্ শি বি র্ বাঁ চা তে

I ণ্া ণ্া -সা | সা সা -া I -া -া -া | -া -া -া II II
শ প থ্ ক রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দেশাত্মবোধক গান

গীতিকার ও সুরকার: আপেল মাহমুদ
তাল: দ্রুত দাদরা

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
পাড়ি দেব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে ॥

জীবন কাটে যুদ্ধ করে
প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে
জীবনের সাধ নাহি পাই।
ঘর-বাড়ি ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার সীমানা সঠিক নাই।

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে ॥

জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না।

বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়।
হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শঙ্খ শোনায়
দেখি ঐ ভোরের পাখি গায়।

তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পারে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে ॥

	+				০											
II	সা	-া	জ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	-মা	I	মা	মা	পা	|	পা	মজ্ঞা	-া	I
	তী	র্	হা		রা	এ	ই		ঢেউ	য়ে	র্		সা	গর্	০	
															||	
I	মা	জ্ঞা	-া	|	সা	সা	-া	I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	পা	ড়ি	০		দে	ব	০		রে	০	০		০	০	০	
I	পা	-া	ণা	|	পা	র্সা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-র্রা	-র্জ্ঞা	I
	আ	ম্	রা		ক	জ	০		০	০	০		০	০	ন্	
I	র্রা	র্সা	-র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-র্রা	-র্জ্ঞা	I
	ন	বী	ন্		মা	ঝি	০		০	০	০		০	০	০	
I	র্রা	-া	র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	হা	ল্	ধ		রে	ছি	০		০	০	০		০	০	০	

I র্সা -া পা | ণা পা মা I পদা -পা মা | জ্ঞমা -জ্ঞা -া II
শ ক্ ত ক রে ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

II {ণা ণা পা | ণা ণা র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I
জী ব ন্ কা টে ০ যু দ্ ধ ক রে ০

I র্সা র্সা -ণা | র্সা র্সা -র্রা I র্রা -া র্রা | র্রা র্রা -া I
প্রা ণে র্ মা য়া ০ সা ঙ্ গ ক রে ০

I -া -া র্রা | র্রা র্রা -া I র্রা -া -র্সা | র্রা মর্জ্ঞা -া I
০ ০ জী ব নে র্ সা ০ ধ্ না হি০ ০

[-া -া -া -া]
I র্জ্ঞা -া -া | -া -া -া I -া -া (র্সা | -র্জ্ঞা -র্মা -র্পা I
পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই ও ০ ০ ০

I র্মা -া -র্পা | -া -া -া I -া -া -া | -া -র্দা -র্পা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্মা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া র্পর্মা র্জ্ঞা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০

I -া -া র্জ্ঞা | র্পা র্মা -া I র্জ্ঞা -া র্সা | -া ণা -া)} I
০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া)} I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা I র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্রা -া | র্সা -না -া I
ঘ০ র্ বা ড়ি ঠিঁ ০ কা না০০ ০ না ০ ই

I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | -া র্জ্ঞা -র্রা I র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্রা -া | র্সা না -া I
দি ন্ রা ত্ ত্রি ০ জা না০০ ০ না ০ ই

I -া -া দনা | ননা না -া I র্সা র্সা -া | র্রা র্রা র্রা I
০ ০ চ০ লার্ সী ০ মা না ০ স ঠিঁ ক্

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

I র্সা র্সা না | র্সা র্জ্ঞর্রা -র্রা I র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
জা নি ০ শু ধু ০ চ ল্ তে হ্ বে ০

I -া -া না | র্সা র্রা -া I র্সা -র্সা ণা | ধা পা -া I
০ ০ এ ত রী ০ বা ই তে হ্ বে ০

I -া -া পণা | ণা ণা -া I ধা ধা -া | পা মা -া I
০ ০ আ০ মি যে ০ সা গ র্ মা ঝি ০

I পদা -া -া | -া -া -া I পা -া -মা | -া জ্ঞা -া II
রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া সজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | রজ্ঞা রা সা I
০ ০ জী০ ব নে র্ র ঙে ০ ম০ ন্ কে

I ণ্া ণ্া -সা | সা -া -া I -া -া সা | জ্ঞজ্ঞা মা -া I
টা নে ০ না ০ ০ ০ ০ ফু লের্ ও ই

I মা -া মা | মা মা জ্ঞা I {মা মা -পা | পা -া -া} I
গ ন্ ধ কে ম ন্ জা নি ০ না ০ ০

I -া -া জ্ঞা | মা পা -ণা I ণা -া ণা | ণা ণা -পা I
০ ০ জো ছ না র্ দৃ শ্ শ চো খে ০

I ণা ণা -র্সা | র্সা -া -া I
প ড়ে ০ না ০ ০

সমবেত

I ণর্সা -া -া | ণর্সা -া -া I ণর্সা -া -া | ণর্সা -া -া I
না০ ০ ০ না০ ০ ০ না০ ০ ০ না০ ০ ০

একক

I -া -া ণর্সা | র্সা র্সা র্সা^{ণ} I ণা ণা পা | পা পা মা I
০ ০ তা০ রা ও তো ভু লে ০ ক ভু ০

I জ্ঞা জ্ঞা -মা | মা -া পমা I জ্ঞা -া মজ্ঞা | সা জ্ঞা -া I
ডা কে ০ না ০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০

I -া -া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | রজ্ঞা রা সা I
০ ০ জী ব নে র্ র ঙে ০ ম০ ন্ কে

I ণা -ণ্া -সা | সা -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
টা নে ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {ণা -া পা | ণণা ণা র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I
বৈ ০ শা খের্ ও ই রু দ্ র ঝ ড়ে ০

I র্সা র্সা -ণা | র্সা র্সা -র্রা I র্রা -া -া | র্রা র্রা -া I
আ কা শ্ য খ ন্ ভে ঙে ০ প ড়ে ০

I -া -া ণা | র্সা র্রা র্জ্ঞা I র্রর্জ্ঞা র্রা র্সা | র্রা র্রা র্মা I
০ ০ ছে ড়া পা ল্ আ০ পে ০ ছিঁ ড়ে ০

[-া -া -া -া]
I র্জ্ঞা -া -া | -া -া -া I -া -া (র্সা | র্জ্ঞা র্মা র্পা I
যা ০ ০ য়্ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০

I র্মা র্পা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া র্ধা র্পা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্মা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া পা I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা | র্পা র্মা র্জ্ঞা I র্সর্রা র্সা -া | -া ণা -া I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া)} I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্রা -া | র্সা পা র্জ্ঞা I
হাত ০ ছা নি দে য়্ বিদ্ দু০০ ৎ আ মা য়্

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্রা -া | র্সা না -া I
হ ঠা ৎ কে যে ০ শ ঙ০০ খ শো না য়্

I -া -া পনা | না না না I র্সা র্সা -া | র্রা র্রা র্মা I
০ ০ দে০ খি ও ই ভো রে র্ পা খি ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
গা য়্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা না | র্সা র্সা র্রা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্গা I
ত০ বু ০ ত রী ০ বা ই তে হ বে ০

I -া -া ণা | র্সা র্সা র্রা I র্সর্রা র্সা ণা | ধা পা -া I
০ ০ খে য়া পা রে্ নি০ তে ০ হ বে ০

I -া -া পণা | ণণা ণর্সা ণা I ধা ধা -া | পা মা -া I
০ ০ য০ তই ঝ০ ড় উ ঠু ক্ সা গ ০

I পদা -া -া | -া ণা দা I মা পা মা | জ্ঞা মা জ্ঞা I
রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া II II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

অনুশীলনী

১। একটি পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।

২। স্বদেশ পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর।

৩। তেওড়া তালে নিবদ্ধ একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও।

৪। প্রকৃতি পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও।

৫। ষড়ঋতুর নৈসর্গিকরূপ ফুটে উঠেছে এমন একটি নজরুলসংগীত পরিবেশন কর।

৬। কাজী নজরুলের একটি ইসলামী গান পরিবেশন কর।

৭। নজরুলসৃষ্ট রাগে একটি নজরুলসংগীত পরিবেশন কর।

৮। নজরুল ইসলাম রচিত একটি শ্যামাসংগীত গেয়ে শোনাও।

৯। একটি ঋতুভিত্তিক নজরুলসংগীত পরিবেশন কর।

১০। দাদরা তালে নিবদ্ধ একটি লালনগীতি পরিবেশন কর।

১১। একটি হাসন রাজার গান গেয়ে শোনাও।

১২। একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাও।

সমাপ্ত